দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর জীবনবীক্ষার প্রথম পর্ব

১

সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিকে লেখকের জীবনদর্শনের বিবর্তনের নিরিখে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি হল 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৫২), 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১), 'বি. টি. বোডের ধারে' (১৯৫২), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৩), 'সওদাগর' (১৯৫৬), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'বাঘিনী' (১৯৬০), 'ছিন্নবাধা' (১৯৬২), 'জগদ্দল' (১৯৬৬) প্রভৃতি। সমরেশ বসুর প্রথম রচিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'। এই উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। 'নয়নপুরের মাটি' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। লেখক বাইশ বছর বয়সে ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি করার সময় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসটি লেখক একজন শিল্পীর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন। এছাড়া পরবর্তীকালে আরো দুটি উপন্যাস 'ছিন্নবাধা' (১৯৬২), 'টানাপোড়েন' (১৯৮০) ও শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' (১৯৯২) শিল্পীর জীবনকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। শিল্পী চরিত্রের প্রতি লেখক সমরেশ বসুর অসীম শ্রদ্ধা ও গভীর আকর্ষণ ছিল। জীবনের প্রথম পর্বে লেখকের অভিপ্রায় ছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপধ্যায়ের অভিমত — "নারীর শরীরী রহস্য তাঁর তুলিকে গতিশীল করে তুলেছে। শিল্পীর যন্ত্রণায় তাঁর যে সহজাত দীক্ষা, তার প্রথম প্রকাশ 'নয়নপুরের মাটি'তে।"[১] এই সময় তিনি নৈহাটি শহর ত্যাগ করে জগদ্দল আতপুরের বস্তি অঞ্চলে বাস করেছিলেন। তিনি সাহিত্যজগতে এসেছিলেন মার্কসীয় জীবনদর্শনের প্রতি সীমাহীন আস্থা নিয়ে। তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই জড়িত ছিলেন। তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ হয়।

এই উপন্যাসের নায়ক মহিম। মহিম শিল্পী, তার শিল্পীসত্তা জন্মগত। মহিম পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শিল্পের সাধনা করেছে। সে শৈশব কাল থেকে মনের ভাবনাকে মাটিতে রূপ দিত। স্কুল পালিয়ে সে কুমোর বাড়ির কারিগরদের কাছে যেত, বিশেষ করে অর্জুন পালের কাছ থেকে মূর্তি ও দেবদেবীদের প্রতিমা তৈরির কাজ শিখেছে। কুমোর অর্জুন পাল তাঁকে হাতে ধরে কাজ না শেখালেও মহিম তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছে। কখনো মার খেয়েছে দাদা ভরতের কাছে, ধমক খেয়েছে বৌদি অহল্যার কাছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে কিশোর শিল্পী। দুপুরের তপ্ত রৌদ্র মাথায় করে সে নদীর খাল থেকে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। মাটির সন্ধান পেয়ে তার চোখে নূতন স্বপ্ন ভেসে ওঠে। পিতৃ-মাতৃহীন মহিম সংসারের চরম আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে নিজের শিল্পী সত্তাকে বজায় রেখেছে। বৌদি অহল্যার অনুপ্রেরণায় বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। লেখক সমরেশ বসু অতি অল্প বয়স থেকেই জীবনের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছিলেন।

নয়নপুরের পাগলা গৌরাঙ্গ শিল্পী। সে মহিমের শিল্প প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়। মহিমের শৈল্পিক সত্তাকে বিকাশের জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসে। রাজধানীর মিউজিয়ম, চিত্রকলা, আর্ট স্কুল বিশেষ করে কৃষ্ণনগর ঘুরে মহিম অভিভূত হয়েছে। একজন বড় শিল্পী হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে সে। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর অচেনা অপরিচিত শহুরে জীবনে মহিমের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর শিল্পের প্রতি অনুরাগ কমেনি, কিন্তু প্রাণটা যেন জগদ্দল পাথরের চাপে পিষ্ট হচ্ছিল। কলকাতার নাগরিক কোলাহলে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। মহিমের প্রাণ কেঁদেছে সেই নির্জন গ্রামটির জন্য, নয়নপুরের মানুষের জন্য। দাদা ভরত ও বৌদি অহল্যার সঙ্গে নয়নপুরের মাটির টানে কলকাতা শহর থেকে সে আবার ফিরে আসে। শিল্পী পাগলা গৌরাঙ্গকে আমরা মহিমের শিল্পের নিয়ন্ত্রক বলতে পারি। শুধু মহিমের নয়, সে সমগ্র নয়নপুরের জনগণের অলক্ষ নিয়ামক। পাগলা গৌরাঙ্গ প্রতিবাদী শিল্পী। নয়নপুরের ভাগচাষি ও ভূমিহীন চাষিদের জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করার সাহস জুগিয়েছে। মহিম গ্রামে ফিরে শিল্পী পাগলা গৌরাঙ্গের আদর্শে নতুন করে শিল্প চর্চা শুরু করে। পাগলা গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরি করে নিজের ঘরে রাখে।

শিল্পী মহিম পুতুল, হর-পার্বতীর মূর্তি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে শিল্পী জীবন শুরু করে। কিন্তু এই সব মূর্তি তৈরির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীমনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়নি। মহিম একদিকে যেমন

প্রকৃতির শিল্পী, অন্যদিকে শিল্পীসত্তা তাঁর ধাতুগত, স্বতঃস্ফূর্ত। মহিম প্রতিবাদের শিল্পী, বিদ্রোহের শিল্পী। তাই সে জমিদার হেমবাবুর দুর্গা প্রতিমা গড়ার প্রস্তাব অনায়াসে অগ্রাহ্য করেছে। মহিম কারো নির্দেশে শিল্প গড়তে চায় না। জমিদারের দুর্গা প্রতিমা তৈরির অনুরোধ প্রত্যাখানের মধ্যদিয়ে সে পুরাতন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। লোভের কাছে নিজেকে উৎসর্গ না করার সাহসী মানসিকতাটিই শিল্পী মহিমের শিল্প তৈরির মূল অনুপ্রেরণারূপে কাজ করে। তাই সে জমিদারের গান্ধীমূর্তি ও তার পুত্রবধূ উমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি তৈরির প্রস্তাবে কোন উৎসাহ পায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত — "শিল্প শুধু শিল্পের জন্য (Art for arts sake) এ বোধ সমরেশের প্রথম থেকেই চরম অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়েছে। শিল্পের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকবে, তার নিজস্ব একটা বক্তব্য থাকবে। তা না হলে মূলছেঁড়া আদর্শহীন শিল্প উচ্ছৃঙ্খল; গন্তব্যহীন, দুর্নৈতিক ও দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে উঠবে। শিল্প মানুষের লড়াইয়ের হাতিয়ার, সংগ্রামের শাণিত অস্ত্র। গৌরাঙ্গসুন্দরের উক্তি মহিমের সারা জীবনে বীজমন্ত্রের মতো কাজ করেছে ঃ 'শিল্প সাধনা আপসের পথ ধরবে যদি না তুমি এ মানুষের বাঁচার তাগিদে ভাস'। তাই বুদ্ধ বা শিব-পার্বতী বা দুর্গা প্রতিমার মূর্তি তৈরির প্রাথমিক আকুতি তার শিল্পীমনের সামাজিক ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে পারল না। তাই সে জমিদার বাড়ির প্রতিমা গড়ার আহ্বান অগ্রাহ্য করেছে। তার শিল্পৈষণা স্বেদ-শ্রমমিশ্রিত খেটে-খাওয়া কায়ক্লিষ্ট মানুষের রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্তরে আত্যন্তিক তাগিদ অনুভব করেছে।" [২]

মহিম প্রতিবাদের শিল্পী। সে প্রতিবাদ করেছে জমিদারের শোষণনীতির বিরুদ্ধে। জমিদার দীর্ঘদিন সরকারকে খাজনা ফাঁকি দিয়েছে। জমিদার এই অতিরিক্ত করের বোঝা অন্যায়ভাবে জোর খাটিয়ে ভাগচাষি ও চাষিদের উপর চাপিয়ে দেয়। খাজনা পরিশোধ না করলে জমিদার অন্য লোককে জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়। শত বছরের পুরনো প্রথা অনুসারে জমিদার আর মালিক যৌথভাবে দরিদ্র চাষিদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। জমিদারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভাগচাষিদের সঙ্গে মহিম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হরেরামের ধর্ম্মোঠাকুরের পূজার প্রস্তাবকে সমর্থন করে মহিম ধর্ম্মোঠাকুরের মূর্তি গড়ার দায়িত্ব নেয়।

শিল্পী মহিমকে সামাজিক নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জমিদারের আমলা দীনেশ সান্যাল তাঁকে চাষার ছেলে আর্টিষ্ট হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে, উপহাস করেছে। অপরদিকে পারিবারিক আর্থিক অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে দাদা ভরত তাঁকে মূর্তি গড়ার কাজে নিরাশ করেছিল। কারণ ভরতের

কাছে শিল্পের থেকে অর্থের মূল্য বেশি। কিন্তু বৌদি অহল্যা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মহিমকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর মনে নতুন করে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। বড় শিল্পী হতে হবে। এখানে বৌদি অহল্যার সঙ্গে 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের রামকিঙ্করের বৌদি বসন্তবালার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের নায়ক রামকিঙ্করকে বৌদি বসন্তবালা বড় শিল্পী হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। মহিমের জীবনেও অহল্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মহিম শিল্পের মধ্য দিয়ে জমিদার শ্রেণির অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মহিম দেখেছে অক্ষয় জোতদারের কাছে ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া অখিলের প্রিয় মহিষ অনাহারে মারা যায়। অসহায় অখিল দুঃখে রাগে ক্ষোভে যন্ত্রণায় মৃত মহিষের পিঠের ওপর মুখ রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মহিম এই ভাবনাটিকে শিল্পে রূপ দিয়ে জোতদার অক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

জমিদার অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করলে ভাগচাষি ও কৃষকেরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় ভাগচাষি হরেরাম। জমিদার ভাগচাষিদের কাছে তার পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে বিদ্রোহের নেতা হরেরামকে চক্রান্ত করে নৃশংসভাবে খুন করে। শিল্পী মহিম মৃত হরেরামের মূর্তি গড়ে জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জোয়ার বয়ে দেয়। এই উপন্যাসের চরিত্ররা সংগ্রামশীল। হরেরাম আজ ভূমিহীন চাষি। জন্মসূত্রে সে ভূমিহীন ভাগচাষি ছিলনা। পিতৃপ্রদত্ত সাতবিঘা জমির মালিক ছিল সে। নয়নপুরের অন্যান্য চাষিদের মতো তার শেষ সম্বল খালের ধারের চাষের জমিটুকু জমিদারের দখলে চলে যায়। হরেরাম নয়নপুরের আর পাঁচজন ভূমিহীন চাষির মতো অদৃষ্ট বা নিয়তিকে মেনে নেয়নি। প্রতিবাদী সংগ্রামী চাষি ভজন হরেরামের বিদ্রোহকে সমর্থন করে বলেছে — "ওরা বুঝি ভাবছে, হরেরামেরে মেরে ফেলে মোদের চুপ মারিয়ে দেবে। কিন্তুক আগুন ওরা জ্বালল ভাল হাতে। হরেরামের মন্তর মোরা ভুলব না।" বিদ্রোহী কৃষক হরেরামের নেতৃত্বে ভাগচাষিরা খাজনা বন্ধ করে দেয়, বেগার খাটার প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদী হরেরামের সংগ্রামী ভূমিকায় জমিদার-গোমস্তারা ভয় পেয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত গোপনে হীন চক্রান্ত ক'রে তারা তাকে হত্যা করে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অভিমত পোষণ করেছেন — "তবু সে বেঁচে রইল নয়নপুরের নিরন্ন খেটে-খাওয়া মানুষের নয়নের মণি হয়ে — মহিমের হাতের যাদুতে সৃষ্ট মৃত হরেরামের ভয়ংকর মূর্তি জীবন্ত জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো হঠাৎ জাগ্রত কৃষককুলকে প্রতিশোধস্পৃহ করে তুলল। এইভাবেই মহিমের শিল্পসাধনা আঘাতে-সংঘাতে

মুখর সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে যা লেখক সমরেশ বসুরই সচেতন কণ্ঠস্বর বলে ধরতে কোন অসুবিধা হয় না।"[৩]

উপন্যাসের অপর চরিত্র কুঁজো কানাই বিকলাঙ্গ হলেও প্রতিবাদী চরিত্র। কুঁজো কানাই তার বিকলাঙ্গ শরীরের জন্য ঈশ্বরকেই দায়ি করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস নেই। কিন্তু সমাজের কোন অন্যায়, অত্যাচার দেখলে সে প্রতিবাদ করে। কালুমালা অর্থের লোভে তার সুন্দরী কন্যাকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেয়। বৃদ্ধ স্বামী প্রতিদিন স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করলে কানাই প্রতিবাদ করে। শিল্পী মহিম কুঁজো কানাইয়ের প্রতিবাদকে সমর্থন করে। সে নির্যাতনকারী বৃদ্ধ স্বামীকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বৃদ্ধ স্বামীকে মারার জন্য মালারা তাকে অপমানিত করেছে। মালাদের আচরণে সে দুঃখ পেয়েছে, তবু সে প্রতিবাদের পথ থেকে পিছুপা হয়নি। সে শিল্পী মহিমের কাছে জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সংবাদ বহন করে আনে। কৃষকের প্রাপ্য ফসল মাঠ থেকে তারা কেটে আনবে। জমিদারের কোন বাধা বা শাসন মানবে না। জমিদারের অধীনে কৃষকরা আর গোলাম হয়ে থাকবে না। কুঁজো কানাইয়ের অপঘাতে মৃত্যুর পর মহিম তার মূর্তি তৈরি ক'রে প্রতিবাদমুখর একটি মানুষকে মূক সমাজে দৃষ্টান্ত রূপে স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে।

জমিদারের পুত্রবধূ উমা মহিমকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। উমার ইচ্ছে মহিম কলকাতায় গেলে বড় শিল্পী হতে পারবে। মহিম উমার প্রস্তাবে কলকাতায় যেতে অস্বীকার করে। সে জানিয়ে দেয় নয়নপুর ছেড়ে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। জমিদারবাবু মহিমকে তার বাড়িতে শিল্পীর চাকরির প্রস্তাব দেয়। মহিম সে প্রস্তাবও প্রত্যাখান করে। সে অর্থের বিনিময়ে তাঁর শিল্পীসত্তাকে বিকিয়ে দিতে চায় না। জমিদার মহিমের আচরণে অপমানিত বোধ করে। জমিদার অন্যায়ভাবে মহিমের উপর প্রতিশোধ নেয়। ভরতের মৃত্যুর পর জমিদার মহিমের বিরুদ্ধে মিথ্যা ঋণের মামলায় জড়িয়ে তাঁকে ও বৌদি অহল্যাকে ভিটে ছাড়ার নির্দেশ দেয়। উমা মহিমকে জমিদারের ঋণের পরিশোধের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উমার কাছ থেকে টাকা নিতে সে অস্বীকার করে। একদিকে জমিদারের দেওয়া চাকরির প্রস্তাব, অন্যদিকে পুত্রবধূ উমার দেওয়া কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব অবজ্ঞার সঙ্গে মহিম প্রত্যাখান করে। জমিদার তাঁকে গৃহচ্যুত করলেও সে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। কোন লোভ লালসা মহিমকে টলাতে পারেনি। জমিদারের পেয়াদা মহিমের বাড়ি

দখল করতে এসে তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনার তৈরি মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করেছে। মহিম জমিদারের নিষ্ঠুর আচরণে দুঃখ পেয়েছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বৌদি অহল্যা মহিমকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বলেছে যে জমিদার আসলে মহিমের কাছে পরাজিত, তাই এভাবে শোধ নিচ্ছে। জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মহিম ও বৌদি অহল্যা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু জমিদার মহিমের স্বাধীন শিল্পীসত্তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। মহিম বৌদি অহল্যার মূর্তি তৈরির মধ্য দিয়ে আবার নূতন করে শিল্পী জীবন শুরু করে। সমালোচক বলেছেন "বলিষ্ঠ জীবনমুখী শিল্পসৃষ্টি গণচেতনা বৃদ্ধির যে একটা শক্তিশালী মাধ্যম, শাসকের অত্যাচারী নিষ্ঠুর রূপকে অনাবৃত করে শোষিত মানুষের ঘৃণা আর প্রত্যাঘাত করার প্রবণতাকে যে তীব্রভাবে তা উদ্বেজিত করতে পারে, 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের নায়ক মহিমের শিল্পসাধনা ও সেখানকার এতদিন মুখ-থুবড়ে-পড়ে-থাকা মানুষের রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে আর একবার তা প্রমাণিত হল। সেইজন্য অনেক প্রলোভনের টোপ ফেলেও আত্মবিক্রীত হতে অস্বীকৃত মহিমকে যখন কিছুতেই জমিদার-জোতদাররা কব্জা করতে পারল না, তখন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে খাজনা অনাদায়ে নীলামে চড়িয়ে একরাত্রির মধ্যে তাকে ও বৌদি অহল্যাকে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাদের একাকী যেতে হয়নি ঃ 'তাদের পেছনে চলেছে অনেক মানুষ, যেন ক্রোধে বেদনায় আত্মহারা মূক মিছিল একটা'।"[৪]

শিল্পী মহিম চরিত্রের সঙ্গে আমরা কখনো কখনো নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'যৌথ' গল্পের স্বরূপ চরিত্রের সাদৃশ্য পাই। স্বরূপ মৃত্যুর পূর্বে বৌদি মালার যৌবনকালের অসমাপ্ত মূর্তি গড়ে তাঁর শিল্পকে অক্ষত রেখে যায়। অন্যদিকে বৌদি অহল্যার মূর্তি তৈরির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মহিম তাঁর শিল্পী জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে ও তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে যায়। মহিমের শিল্প সাধনা জীবন-সম্পর্কহীন কোন কল্পনা নয়; তাই নয়নপুর, রাজপুর, খালমাঠ, অখিল, কুঁজো কানাই, অর্জুনপাল, গোবিন্দ, বনলতা, পীতাম্বর, ভজন এমনকি দাদা ভরত তাঁর শিল্পের কেন্দ্র রূপে বিরাজিত। মহিম অখিলের মৃত মহিষের মূর্তি ও মৃত হরেরামের ভয়ঙ্কর মূর্তি গড়ে কৃষককূলকে উদ্দীপিত করেছে। মহিমের শিল্পসাধনা আঘাতে সংঘাতে সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এগিয়ে গেছে। তাই মহিম ধ্বংস হয়ে যেতে প্রস্তুত কিন্তু পরাজয় স্বীকার কখনোই করেনি। জীবনপ্রেমিক সমরেশ বসু এই ভাবেই একজন শিল্পীর সংগ্রামমুখর জীবন চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের জয়কেই ঘোষণা করে যান।

সমালোচকের মতে "মহিম চরিত্র অনেকটাই সমরেশের ব্যক্তিজীবনের প্রথম পর্বের অভিপ্রায় এবং বেদনার উপাদানে নির্মিত, বাকীটা তাঁর নবলব্ধ রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা স্পৃষ্ট।" [৫]

'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসে সমরেশ বসুর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন আছে। লেখক যেন তাঁর চিন্তা ও কর্মের জগতের প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র হিসাবে মহিমকে অঙ্কন করেছে। সংগ্রামে ও কর্মনিষ্ঠায় মহিম একক। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েও সে চিত্ত ও সম্ভ্রমবোধকে বিসর্জন দেয়নি। শ্রম ও বিবেকবোধ মহিম চরিত্রের দুই অবিচ্ছিন্ন দিক। শ্রমিকের প্রতি, শ্রমের প্রতি মার্কসবাদী লেখকের যে শ্রদ্ধা ছিল তা মহিম চরিত্রটি অনুধাবনে স্পষ্ট হয়। দরিদ্র মহিম অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছে তবুও অন্যায়ের কাছে হার স্বীকার করেনি। শ্রমিকজীবনের সন্নিকটে এসে সমরেশ বসু যে সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের এই উপন্যাসে মহিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন। এই হিসাবে মার্কর্সবাদী সমরেশের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এই উপন্যাসে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। আবার কেবল এক মতাদর্শের দায় নয় শিল্পী জীবনের দায়বদ্ধতাকে উপস্থাপিত করেছেন এই উপন্যাসে। দুঃখের সাগর অতিক্রম করে মানুষ শিল্পী হয়ে ওঠে। শিল্প, মানুষের কাছে বিলাস নয়; বিবেক শ্রম ও সংগ্রামের অপর নাম শিল্প — মহিম চরিত্র পর্যালোচনায় তা স্পষ্ট হয়। ❑

২

'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'। উপন্যাসটি তিনি জেলে বসে লিখতে শুরু করেন। লেখক নিজে স্বীকার করেছেন যে, জেলবাস তাঁর জীবনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। বন্দী জীবনই তাঁর দৃষ্টিকে করেছে স্বচ্ছ আর সুদূরপ্রসারী, যদিও তার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। তিনি ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি করা কালীন (১৯৪৩-১৯৪৯) কখনো ছুটির অবকাশে কখনো কাজের শেষে রাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠা চটকলগুলোর চারপাশে। পার্টির কাজে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি বার বার গেছেন চটকলের আশে পাশে গজিয়ে ওঠা নোংরা বস্তিতে। সমরেশ বসু একটি ঐতিহাসিক সময়কে কেন্দ্র করে এই

উপন্যাসটি রচনা করেছেন। পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়ের মতে — "একটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিকে লেখক উপন্যাসে এনেছেন, বিশেষ রাজনৈতিক সচেতনতায়।"[৬] এই উপন্যাসে লখাই অর্থাৎ লক্ষীন্দর ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির নায়ক। তার পূর্ব-নাম ছিল হীরালাল। হীরালাল বিদ্রোহী সিপাহী ছিল। ভারতীয় হিন্দু সিপাহীরা বিদ্রোহী সেনাপতি তাঁতিয়া তোপির নেতৃত্বে গোরা কোম্পানি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহী তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব ও ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ হিন্দুস্থানে নতুন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল ইংরেজ সেনার কাছে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বেরিলি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেয়। গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে ক্লান্তিতে শিথিল হয়ে সে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফরাসডাঙ্গায় এসে পৌছায়। পরাজিত বিদ্রোহী সিপাহী মৃতপ্রায় অবস্থায় চিৎকার করে বলতে চেয়েছে — "জয় হোক হিন্দু সিপাহীর। বরবাদ হোক কোম্পানির।" ফরাসডাঙ্গার বৃদ্ধ পাটনি ও তার পুত্র চূড়ামণির সেবায় সে নবজন্ম পায়। শ্যাম বাগদীর ঘরে লখাই এর নবজীবন শুরু হয়। সে তার পূর্বপরিচয় গোপন রাখে। পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়ের মতে — "হীরালাল এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যোদ্ধা — সে "নিঃসাড় হতচেতন হয়ে" এসে পৌঁছল জগদ্দল-সেনপাড়ার গঙ্গার মাটিতে। ইতিহাসের এই দুই প্রান্তকে জোড়া লাগান সমরেশ বসু হীরালালের লক্ষীন্দর বা লখাইএ রূপান্তরিত হওয়ায়।"[৭] লখাই প্রতিবাদী ও সংগ্রামী। ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় সে পুরাতন সমাজ অর্থনীতির ভাঙনকে দেখেছে। ভারতীয় জমিদার শ্রেণি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরেজদের কাছে করুণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। লখাই ভারতীয় জমিদার শ্রেণির ইংরেজ শাসকদের কাছে করুণ আত্মসমর্পণ মেনে নিতে পারেনি। এই উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় কৃষি নির্ভর মানুষ জমিদার মহাজনদের শোষণের শিকার হয়েছে। শোষিত ভূমিহীন কৃষকরা গ্রামের ধুলোমাটি মুছে শহুরে চটকলের শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছে। লখাই বিট্রিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

লখাই ঐতিহাসিক ট্রাজেডির নায়ক। বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল রাজনৈতিক পরাজয়ের সাক্ষী। অন্যদিকে লখাই বাগদী নিম্নবর্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের প্রত্যক্ষদর্শী। এক ব্যক্তির দুই সত্তার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ভাঙনকে দেখেছে সে। লখাই জমিদার সেনবাবুদের বাড়িতে প্রহরীর চাকরি পায়। জমিদার সেনবাবু ইংরেজ কোম্পানির দৌলতে বড় লোক হয়েছে। লখাইকে তার পূর্বপরিচয়

জিজ্ঞাসা করলে লখাইয়ের চোখে ভেসে ওঠে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিন্দু সিপাহীর লড়াই, কামান বন্দুকের গুলি, খুন জখমের রক্ত আর মৃত্যুর আর্তনাদ। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন — "হীরালাল এবং লখাই যেন দুই ভিন্ন প্রজন্মের মানুষ। হীরালাল সেই প্রজন্ম থেকে উঠে এসেছে, কোম্পানিরাজ উৎখাত করার জন্য যারা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। দেশকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাঁরা। ঘৃণায়-বীর্যে, জয়-পরাজয়ে, উল্লাস-বিষাদে হিন্দুস্থান যেখানে রণক্ষেত্র, হীরালালের নাড়ির বন্ধন সেখানেই। সে পরাজিত, তবু যোদ্ধা। নানা সাহেবের মতো আরো অনেকেই হয়তো আত্মপরিচয় গোপন করে সুযোগের অপেক্ষা করছে। লখাইয়ের আড়ালে হীরালালকেও হারিয়ে যেতে হয়েছে।"[৮]

সিপাহী যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানি জয়লাভ করেছে। বীর সেনাপতি তাঁতিয়া তোপি ও ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং নানা সাহেব জেলে বন্দী হয়েছেন। এ সংবাদ লখাইকে মর্মাহত করেছে। মহারানী ভিক্টোরিয়া তথা লণ্ডনেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হয়েছেন। ফিরিঙ্গি রাণী এদেশের রানী হয়ে ফাঁসির হুকুম দেবেন। বিদ্রোহী লখাই তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। লখাই ফুঁসতে থাকে ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ছুটে যায় জমিদার মজুমদার বাড়ির সেজকর্তার কাছে, বলে ফিরিঙ্গিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য। কিন্তু সেজকর্তা লখাইকে বলে — আমরা এখন নিধিরাম সর্দার। লখাই সেজকর্তার কাছ থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। পরাধীনতার গ্লানি ও আত্মযন্ত্রনায় বিদ্রোহী লখাই এর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। তার ভয়ঙ্কর হিংস্র রূপ দেখে স্ত্রী কাঞ্চিবউ ভয় পায়। লখাই কাঞ্চিবউকে বলে তার ক্রোধ ইংরেজ গোরা কোম্পানির উপর। লখাই প্রতিবাদ করতে চায় গোরা কোম্পানির বিরুদ্ধে, জানাতে চায় এদেশের বিদ্রোহী সিপাহীয়ের লড়াইয়ের কথা, ফিরিঙ্গিদের রক্তে রাঙিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু সে তা পারে না। নিজের গোপন পরিচয় কাঞ্চিবউকে জানিয়ে লখাই শান্তি পায়।

ভিক্টোরিয়া মহারানী ভারতেশ্বরী উপাধি নিয়েছেন। এই আনন্দে আতপুরের রাজবাড়িতে ও জমিদার সেনবাড়িতে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজি এনে উৎসবের আয়োজন করা হয়। জমিদার সেন মেজকর্তা দিল্লী যাবেন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। লখাই শুনে বিমর্ষ হয়। নীরবে বেড়িয়ে আসে কাছারি থেকে। কিন্তু লখাই বন্দুকটা ছুঁতে হাত দুটো সাঁড়াশির মত মুঠি পাকিয়ে আসে। জমিদারের শোষণ নীতির ফলে নিঃস্ব অসহায় কৃষকদের প্রসঙ্গে সমালোচক এই অভিমত পোষণ করেছেন —

"গ্রামীন ধূলোমাটি মুছে শহুরে চটকলের শ্রমিক রূপে নিয়োজিত হওয়া নিম্নবর্গীয় এক শ্রেণীর কৃষি নির্ভর মানুষ জমিদার মহাজনদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।"[৯] জমিদার চাষের জমির খাজনা বৃদ্ধি করেন। অনাবৃষ্টি ও রেললাইনের উঁচু জমি প্রাচীরের মত অবরোধের ফলে দিগন্ত বিস্তৃত চাষের জমি ভাগ হয়ে যায় দুভাগে। বাধা পড়ে জল চলাচলের। জমির উর্বরা শক্তি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যায়। মহাজনেরা দারিদ্র্যে নিপীড়িত কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। চড়া ঋণের দায়ে কৃষকরা জর্জরিত হয়। জমিদারের বর্ধিত খাজনা ও মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করতে কৃষকরা অসমর্থ হয়। ফলে তাদের চাষের জমি নিলামে ওঠে। গোরা কোম্পানিরা কৃষকদের উৎপন্ন ফসল জোর করে ছিনিয়ে নেয়। ফরাস ডাঙ্গায় চলতে থাকে প্রকাশ্যে ডাকাতি। গোরা সাহেবদের নির্মম অত্যাচারে গারলের নীলচাষিয়া স্ত্রী-পুত্র রেখে পালিয়ে যায়। লখাই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রেললাইন পাতা শুরু হয়। এই সময় থেকেই ইংরেজ কোম্পানি রেলপথে ভারতের কাঁচামাল ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। ফলে এদেশে সুতো, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামালের অভাব দেখা দেয়। ক্রমশ দেশীয় শিল্প ধ্বংস হতে শুরু হয়। জোলা, জেলে তাঁতি, মুচি এমনকি যারা হাড়ের বোতাম তৈরি করত তারা সকলে পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে চাষের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে বিলেত থেকে মেশিনে তৈরি কাপড় এদেশে আসে। অথচ ফরাসডাঙ্গার তাঁতিরা সুতোর অভাবে তাঁত বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। বাজারে নানা বিলেতি দ্রব্যের আমদানির ফলে মহাজনের মধ্যে খুশির জোয়ার নেমে আসে। এর মধ্য দিয়ে লেখক সমরেশ বসু পুরাতন সমাজ অর্থনীতির ভাঙনকে দেখিয়েছেন।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এদেশে ইংরেজরা চটকল স্থাপন শুরু করে। জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি ও মহাজনের ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে নিঃস্ব কৃষকরা চটকলে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভারতীয় জমিদারের ও ইংরেজের শোষণনীতির ফলে সামাজিক ভাঙন ধরেছে। কানু তাঁতির কাপড়ের নক্সার দক্ষতা থেকে দিল্লীর নবাব বাদশারা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল। হিন্দুস্থানের বাইরে ও কানু তাঁতির হাতে তৈরি নক্সার কাপড় রপ্তানি হত। কিন্তু আজ সুতার অভাবে তার তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। কানু তাঁতি গঙ্গার জলে তাঁত চড়কা ধুয়ে সিঁদুর লেপে সারা দিন তাঁতের উপর মাথা রেখে পুজো দিয়েছে। গভীর দুঃখে ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে কানু শ্যাম বাগ্‌দীকে বলেছে, সে রিষড়ের কলে পাটের বোরা বুনতে যাবে। অর্থাৎ চটকলের কাজে যোগ দেবে। সে

233323 ১৭ 18 OCT 2011
LIBRARY NBU, DARJEELING

জানত চটকলে পুরুষ ও নারীদের ইজ্জত থাকে না। তাই কানু তাঁতি তাঁত ঘরের মাচার বাঁশে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কানু তাঁতি ধ্বংস হয়ে যায়, তবু সে পরাজয় স্বীকার করে না। কানু তাঁতির মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও কন্যা সুতোর অভাবে প্রায় অনাহারে দিন কাটায়। ঋণের দায়ে চাষের জমিটুকুও বেহাত হয়ে যায়। লখাই কানুবউকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কানু বউয়ের কন্যা প্রায় অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কন্যার মৃত্যুতে নিরাশ হয়ে গভীর শোকে ও আত্মযন্ত্রণায় কানুবউ ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়ার আবেদন পত্রটি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। লখাইকে সে বলে ইংরেজরা গায়ের জোরে আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে কি লাভ। কানুবউ অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত তবু সে মাথা নত করতে চায় না। কানুবউয়ের যুবতী মৃত কন্যাকে দেখে প্রতিবাদী লখাইয়ের হাত দুটো ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিংস্রতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঋণের দায়ে কানুবউয়ের শেষ সম্বল ভিটেটুকু মহাজনের ট্যাঁকে চলে যায়। পরিশেষে কানুবউ স্বামী কন্যাকে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে চটকলে যেতে বাধ্য হয়। তাকে চটকলে যেতে দেখে লখাই বিভ্রান্ত হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকে।

এই উপন্যাসের অপর চরিত্র গনি মিঞা। গনি মিঞার পূর্বপুরুষ সুতো তৈরি করত। কোম্পানির দৌরাত্মে জোলারা জাত ব্যবসা ছেড়ে মাঠে নামতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির ফলে মহাজনের ঋণের দায়ে গণি মিঞা শেষ চাষের জমিটুকুও অর্থশালী শরাফত মিঞা নিলামে ডেকে নেয়। জমিদাররা বার বার খাজনা বৃদ্ধি করে কৃষকদের শোষণ করেছে। অর্থশালী ও ঐশ্বর্যবান শরাফত মিঞার সঙ্গে জমিদার সেনবাবু ও গোরা কোম্পানির অত্যন্ত সুসম্পর্ক। গণি মিঞা প্রতিজ্ঞা করেছিল সে কোনদিন গোরা কোম্পানির চটকলে হালাল হতে যাবে না। কারণ সেখানে নারীদের ঈজ্জত থাকে না। প্রয়োজনে সে পরের জমিতে জন খেটে জীবন ধারণ করবে। কিন্তু তার শেষ সম্বল চাষের জমি নিলাম হলে সে সর্বস্বান্ত হয়ে ইংরেজ কোম্পানির কন্ট্রাকটারের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়। গণি মিঞার মৃত্যুর পর তার ছেলে গোলামকে চটকলের কাজ করতে যেতে হয়। গণি মিঞার পূর্বপুরুষের জাতব্যবসা ছিল সুতো তৈরি করা। কোম্পানির দৌরাত্মে জাতব্যবসা সুতো তৈরি করা ছেড়ে মাঠে চাষের কাজে নামতে হয়েছে। জমিদারের শোষণ নীতির ফলে কানু তাঁতির স্ত্রীর মত গণি মিঞার ছেলে চটকলের শ্রমিকে রূপান্তরিত হয় আর আত্মাভিমানী কানু তাঁতি অভাব ও দ্রারিদ্র্যের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে। তবু সে গোরা কোম্পানির কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের

মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন ইংরেজদের শোষণনীতি ও আধুনিক যন্ত্রের ফলে দেশজ কুটিরশিল্প কী ভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং কর্মহীন কারিগররা কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, আবার কেউ ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চটকলের শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছে।

চাষি পবন চাঁড়াল সাহসী ও প্রতিবাদী। ব্যক্তি জীবনে সে জমিদার সেনবাড়ির লাঠিয়াল মহেষ চাঁড়ালের নব বধূকে বিয়ের আসর থেকে তুলে এনেছে। কারণ মহেষের নববধূ পবনের প্রেমিকা ছিল। জমিদারের অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধিকে সে সমর্থন করেনি। চাষের জমি মহাজনের কাছে নিলামে ডাকার জন্য পবন প্রতিবাদ করেছে। সে জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। কিন্তু অসহায় লখাই পবনকে নিরাশ করেছে। সে বলেছে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কি হবে। বিদ্রোহী লখাই প্রতিবাদ করে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে। সে ফিরিঙ্গি ভিক্টোরিয়া মহারাণীর আইন মেনে নিতে অস্বীকার করে। পবন চাঁড়ালের চাষের জমি মহাজন নগিন ঘোষ ঋণের দায়ে পাল জমিদারকে বিক্রি করে দেয়। জমিদারের ভিটে ছাড়ার নির্দেশ পেয়েও নিঃস্ব পবন হেসেছে, স্ত্রী তারাকে সোহাগ করেছে। কিন্তু পবনের বন্ধু জমিদারের আর্দালি তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল জমিদারের কাছে জমি ভিক্ষা চাইতে, তাকে ক্ষমা করতে। কিন্তু পবনের আত্মসম্মান বোধ প্রখর। আত্মভিমানী পবন বন্ধু আর্দালির প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। সে সর্বস্বান্ত হতে প্রস্তুত, তবু সে জমিদারের কাছে মাথা নত করবে না। জমিদার পবনকে মাথা মুড়ে অপমান করে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দেয়। পবন অপমানের জ্বালা ও আত্মযন্ত্রণায় স্ত্রী তারাকে নিয়ে দুমুঠো ভাতের সন্ধানে তেলেনি পাড়ার চটকলে চলে যায়। কারণ তার ধারণা ছিল সেখানে জমিদার ও মহাজনদের মত কোন অন্যায় অত্যাচার নেই, রয়েছে স্বাধীনতা।

পবন চাঁড়ালকে জমিদার অপমান করেছে শুনে লখাই রেগে যায়। সে অগ্নির মত জ্বলে উঠতে চায়। হতাশ হয়ে লখাই বলে আজ আমরা বিষহীন ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছি। অর্থ থাকলে সে জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিত। পবন তার স্ত্রী তারাকে সঙ্গে নিয়ে চটকলে যাত্রা করলে লখাই হতাশ হয়ে তা দেখে। পবনের ধারণা ছিল চটকলে জমিদার ও মহাজনদের মত কোন অন্যায় অত্যাচার নেই, ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। চটকলে এসে সে দেখে এখানেও যন্ত্রের অনুশাসন চলছে। কোনো স্বাধীনতা নেই, নেই নারীদের কোনো ইজ্জত। প্রতিনিয়ত গোরাসাহেব ক্রুকসেন চটকলের শ্রমিকের স্ত্রীদের জোর করে ইজ্জত

লুটতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পবন নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতন মেনে নিতে পারেনি। সাহেব ক্রুকসেন পবনের স্ত্রী তারাকে নির্জন বাড়িতে ধর্ষণ করতে এলে পবন তাকে আক্রমণ করে। সে কাঁকড়ার মত হাত দিয়ে ক্রুকসেনের গলা টিপে ধরে। স্ত্রী তারা পবনের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয়ে গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করে আর পবন স্ত্রীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গ্রামে ফিরে যায়। প্রতিবাদী লখাই চটকলের সাহেবদের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি। ক্রুকসন সাহেবের তারার উপর নির্মম অত্যাচারের কথা শুনে লখাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। পবনের হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্রুকসন সাহেবের উপর প্রতিশোধ নিতে সে তাকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু পবন ক্রুকসন সাহেবকে খুন করতে অস্বীকার করলে লখাই রেগে যায়। সে বলে নিজের স্ত্রীর যে মান রাখতে পারে না তার মৃত্যু ভালো। সেই রাতে পরাজিত পবন আত্মযন্ত্রণায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পবনের মৃত্যুতে লখাই আঘাত পেয়েছে। তার মৃত্যুজনিত চিন্তা লখাইকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত চেপে ধরেছিল। পবন ছিল দুঃসাহসী। সে জমিদার সেন বাড়ির লাঠিয়াল মহেষ চাঁড়ালের নববধূকে ছিনিয়ে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে বলেছে 'কার ক্ষমতা আছে, এসো, লড়বে আমার সঙ্গে, এবধূ আমার।' জমিদারের আর্দালিকে অপমান করতে দ্বিধা করেনি। সমালোচকের মতে — "পবনের সামর্থ্য ছিল অনেক বেশি। লখাইয়ের প্রায় সব গুণই তার ছিল, একমাত্র অন্তর্দাহটি ছাড়া। এ গুণও লখাইয়ের স্বোপার্জিত ছিলনা। তা সে পেয়েছিল হীরালালের কাছ থেকে।"[১০]

নিম্নবর্গীয় কৃষিনির্ভর মানুষ জমিদার মহাজনদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে। পরে তারা হতাশ ও নিরাশ হয়ে গ্রাম ছেড়ে চটকলের শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছে। শ্রীনাথ কাঠুরের খাজনা বাকি ছিল। খাজনা অনাদায়ে জমিদার তার জমি মহাজনকে নিলামে দিয়ে দেয়। জমিদার শ্রীনাথকে গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে। অর্থের অভাবে তার দুই নিঃসন্তান স্ত্রীকে নিয়ে প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে থাকে। অভাবে যন্ত্রণায় শ্রীনাথ কাঠুরে দুই স্ত্রীকে বিলিয়ে দিয়ে চটকলে চলে যেতে চায়। স্বামী শ্রীনাথের ভয়ে তারা দুমুঠো ভাতের জন্য বেঁচে থাকার তাগিদে তেলেনি পাড়ার চটকলে কাজের সন্ধানে রওনা হয়। কিন্তু সেখানেও তারা অত্যাচারিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে।

চটকল গড়ার জন্য ইংরেজ সরকারের নির্দেশে জমিদার জোর করে কৃষকদের জমি দখল করে। লখাই চটকল গড়ার জন্য কৃষকদের জমি বিক্রি করতে নিষেধ করে। কিন্তু কৃষকরা নিরুপায়। জমিদার

কর্তা চাইলে কৃষকরা জমি বিক্রি করতে বাধ্য। লখাইয়ের রক্তে ইংরেজ বিদ্বেষ। মুরলী দাসের আখড়ায় ঝুলন পূর্ণিমার উৎসবে দুই গোরা সাহেব জুতো পায়ে প্রবেশ করে। লখাই প্রতিবাদ করে। আখড়াতে গোরা সাহেব দেখে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো লখাই তাদের আক্রমণ করে। সাহেবকে অপমান করে সে বলে যে কামান থাকলে গলা থেকে তাদের মাথা আলাদা করে দিত। আখড়ার মালিক মুরলী দাস লখাইকে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার মনে পরে যায় সিপাহী বিদ্রোহের কথা। একদা সে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আজ আর তার পলায়নের কোন পথ নেই। জমিদারের নির্দেশে মুরলী দাসের আখড়া গোরা কোম্পানি নিলামে ডেকে নেয়। আখড়া ভেঙে সেখানে চটকলের ইমারত গড়ে ওঠে। শ্যামনগর, আতপুর, সেনপাড়া চটকলে ভরে যায়। লখাই শুধু হতাশ হয়ে সে সব দেখে। সাহেবকে অপমান করার অপরাধে জমিদার সেনকর্তা তাকে প্রহরীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। কারণ জমিদার সেনকর্তা কোম্পানির গোরা সাহেবের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজদের দেওয়া দৌলতে জমিদার লখাইকে চাকরি দিয়েছিল। সমালোচকের অভিমত — "জগদ্দলের সেনেরা ইংরেজের অনুকম্পায় বাঁচতে শেখেন, মুরলীদাস তার আখড়া হারান, গ্রাম-সমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এই বিধ্বংসী কালের বিরুদ্ধে লখাই জ্বলে উঠতে চেয়েছে, কিন্তু তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। বেরিলির রণক্ষেত্রে পরাভবের তাৎপর্য এবং তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম ক্রমশই স্পষ্ট হবে তার কাছে।"[১১] শ্যাম বাগদীর ছেলে মধু লখাইয়ের বিদ্রোহকে সমর্থন করে। সেও ইংরেজ বিদ্বেষী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের জমি হস্তান্তর হয় জমিদারের হাতে, গড়ে ওঠে শহরতলীতে চটকল, ধ্বংস হয় দেশীয় তাঁত, চামড়া শিল্প। ভূমিহীন হয়ে সকলে যাত্রা করে চটকলে কাজের সন্ধানে। কুলটা অধরা তার ছেলের বউকে নিয়ে রওনা হয় চটকলে। নয়ন কাঞ্চীবউয়ের রূপে পাগল হয়ে চটকলের অভিমুখে যাত্রা করে। শ্যামের ভাই নারান মদনের স্ত্রী কাতুকে নিয়ে চটকলে কাজ করতে যায়। নারান চটকলের শ্রমিকের কাজ ছেড়ে ফিরে এসেছে নিজের গ্রামে। লখাই তাকে ইংরাজের গোলাম বলে উপহাস ও অবজ্ঞা করে। নারান তা মেনে নিতে পারেনি। সে প্রতিবাদ করে বলে সমগ্র দেশে চটকল গড়ে উঠবে আর পরোক্ষভাবে নারানও ইংরেজের প্রজা। লখাই তা অস্বীকার করে বলেছে সে কোন দিন ইংরেজের কাছে পরাজয় স্বীকার করে চটকলে কাজ করতে যাবে না।

লখাই সমাজের ধ্বংসের প্রত্যক্ষদর্শী হলেও ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহ করেছে। যখন সড়কের ভাঙা জায়গা গঙ্গার মাটি দিয়ে সংস্কার করছিল, তখন সেই পথে গোরা সাহেব

একা করে আসছিল। লখাই পরাজয় ও ধ্বংসের গ্লানিতে শক্ত হয়ে বসে থাকে সড়কের মাঝপথে। সে রাস্তা রোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছে। গাড়লিয়ার আখড়ার গোরা সাহেব রবার্টসন ও ওয়ালিককে দেখে লখাই অগ্নির মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। লখায়ের দুঃসাহস দেখে গোরা সাহেব তাকে চটকলের শ্রমিকদের শাসনের জন্য চাকরির প্রস্তাব দেয় ও অর্থের লোভ দেখায়। কিন্তু লখাই ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। সে রেগে সাহেবকে বলে তোমাদের টাকা নিয়ে তোমরা বিলেতে ফিরে যাও। প্রত্যুত্তরে সাহেব তাকে বলে আমাদের টাকা সারা পৃথিবীতে খাটাব। লখাইয়ের মনে পড়ে নারানের কথা। নারান তাকে বলেছিল সারা দেশে গোরা কোম্পানির চটকল গড়ে উঠবে। সেও ইংরেজের প্রজা। রাগে, দুঃখে ও যন্ত্রণায় লখাইয়ের চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে আসে। জমিদারের নির্দেশে কৃষকদের জমি বিলি বন্দোবস্ত বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকরা গঙ্গার ধারের জমি কোম্পানিকে বিক্রি করতে বাধ্য, কেননা সেখানে চটকল গড়ে উঠবে। লখাই দেখেছে কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, বাস্তুহারা হয়ে দল বেঁধে চলেছে নতুন ভিটের সন্ধানে, বাস্তুর সন্ধানে। সমালোচক যথার্থ বলেছেন — "ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদে সবাই ছুটল কলকারখানার দিকে, কোম্পানির শাসনের গোপন বিরুদ্ধচারী একমাত্র লখীন্দর ছাড়া।"[১২] হাজার বছরের গড়ে তোলা ও পরিত্যক্ত জনবসতি ভেঙে গড়ে উঠেছে চটকলের ইমারত। লখাই শুধু এখানে নির্মম ধ্বংস প্রক্রিয়ার সাক্ষী হয়েই থাকে না, বিদ্রোহের, প্রতিবাদের নায়কও হয়ে ওঠে। সে ঐতিহাসিক ধ্বংসের মধ্যেই তার পুত্রের নাম রেখেছে হীরালাল — তার পূর্বের স্বাধীন সংগ্রামীর উত্তরসূরী। কিন্তু তার পুত্র হীরালাল কাঠের হাতুড়ি নিয়ে পেরেক পুঁতেছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত — 'গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন — গ্রামের চাষী-কারিকর অভাবের তাড়নায় চটকলে কাজ করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছে ও কারখানার নূতন আবহাওয়া ও কুঠিয়াল সাহেদের অসংকোচ ইন্দ্রিয়লালসা ও যথেচ্ছাচার তাহাদের সমস্ত শৃঙ্খলাবোধ ও ধর্মসংস্কারকে উন্মুলিত করিয়াছে।"[১৩]

আমাদের দেশের এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদলের চিত্রকে দেখানোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। লখাই চরিত্রটির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর জীবনবীক্ষাটি স্পষ্ট হয়, উপলব্ধি করা যায় মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এক জীবনপ্রেমিক শিল্পীর নিজস্ব সত্তাটিকে। সমালোচক এই মত পোষণ করেছেন — "হীরালালের মতোই আর এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের

সাক্ষী তিনি তখন নিজেই। কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানার পরাভবের গ্লানি ও বেদনা বহন করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস হারান নি।"[১৪] সমালোচক প্রসূন ঘোষের মতে — সমরেশ দেখিয়েছেন "ভারতবর্ষীয় পুরাতন সামাজিক-অর্থনীতিক ব্যবস্থার করুণ আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও কোন কোন মানুষ; ব্যক্তি মানুষ জীবনের প্রতি অসম্ভব এক টানে কেমন সংগ্রামী হতে পারে আর তার ফলে তার চোখের সামনে এই বিকিয়ে যাওয়ার চিত্রটা কতটা মর্মান্তিক ও তীব্র বেদনাদায়ক হতে পারে। লখাই তাই এক নির্মম ধ্বংস প্রক্রিয়ার সাক্ষীই হয়ে থাকে, জেহাদের প্রতিরূপ বলেই চিহ্নিত হয়।"[১৫] ❑

৩

সমরেশ বসুর 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি লেখক সমরেশ বসু বস্তির শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে রচনা করেন। ইতোপূর্বে কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্যিকেরা বস্তি অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনসংগ্রাম ও সমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। যদিও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কথাসাহিত্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন অপেক্ষা বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব বেশি পড়েছিল। ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠির দেশে' উপন্যাসে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের চিত্র পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে বস্তিজীবনের ছবি আছে, কিন্তু সেখানে বাস্তবতা নেই, নেই বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'পাঁক' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন — "স্কুলে যেতে লম্বা একটা আঁকাবাঁকা গলি পেরুতে হতো। সেই গলির একটা বাঁকের পাশে মস্ত একটা নোংরা পুকুর। চারপাশে বেশির ভাগ নারকেল পাতা আর দু'-একটার ভাঙা খোলার ছাওয়া গরিবদের বস্তি।" মনীশ ঘটকের রচিত উপন্যাস 'পটল ভাঙার পাঁচালী'তে অসুস্থ বিকৃতির চোরাগলিতে হারিয়ে যাওয়া পঙ্কিল মানুষের চিত্রলিপি পাওয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্ররা নিম্নবর্গের, প্যাঁচপেঁচে পাঁকের মধ্যে তাদের হোগলার কুঁড়ে ঘর। এছাড়া বস্তি জীবন নিয়ে লিখেছেন সুকুমার ভাদুড়ী 'পাঁকের পোকা।'

লেখক সমরেশ বসুর নিবিড় সম্পর্ক ছিল বস্তি অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে। প্রথম জীবনে গৌরীকে জীবনসঙ্গী করে আতপুরের তরফদার পাড়ার বস্তিতে বাস করেছেন। কম পারিশ্রমিকে

ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেছেন। কখনো আবার বেঁচে থাকার তাগিদে সাহেব পাড়ায় ডিমের ব্যবসা করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন বস্তির ঘৃণ্য নোংরা পরিবেশ, নিত্য ঝগড়া - কোন্দল, ঈর্ষা-রেষারেষি ইতর রসিকতা প্রভৃতিকে। দেখেছেন ইছাপুর ফ্যাক্টরির ও চটকলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জীর্ণ শীর্ণ দুস্থ শ্রমিকদের। এই সময় লেখক মার্কসবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন — "কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই, চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ হয়।" তিনি জীবনকে দেখেছেন নানা অভিজ্ঞতায়। তিনি জুটমিলে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করার সময় প্রত্যক্ষ করেছেন শ্রমিক আন্দোলন, চটকলের শ্রমিকদের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, শ্রমিক ছাঁটাই, হরতাল-দাঙ্গা-খুন প্রভৃতি নানা ঘটনাকে। সমালোচক নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের মতে — "জীবিকার তাগিদে জৈব অস্তিত্ব রক্ষার মানসে সমরেশকে যেমন একদিন প্রত্যক্ষভাবে বস্তিবাসী হতে হয়েছিল, সামান্য দৈনিক মজুরীতে ট্রেসারের চাকরি নিতে হয়েছিল, অপরদিকে 'পার্টির কল্যাণে' ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের বহু ধরনের কাজের সঙ্গে হাতেকলমে গভীর সংযোগ হয়েছিল। বহু কল-কারখানা, বিশেষ করে চটকলের শ্রমিকদের জীবিকার নিদারুণ সংগ্রাম সংঘাতের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।"[১৬] লেখক সমরেশ বসু নিছক কল্পনার আশ্রয় করে এই উপন্যাসটি রচনা করেননি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি এসেছে সমব্যথী লেখকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিবিড় পরিচয় থেকে। লেখক নিজেই কবুল করেছেন — "শ্রেষ্ঠ মুখটির সন্ধানে যেতে যেতে মনে পড়ে 'বি. টি. রোডের ধারে' যার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে এক রাত্রেই পাগল প্রায় হয়েছিলাম, মনে করতাম, তার প্রধান পুরুষ চরিত্রটি প্রত্যক্ষত আমিই, কারণ একটি মহত্বের প্রবণতা, তখন সম্ভবত আমার অবচেতনে ক্রিয়াশীল ছিল।"[১৭]

এই উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ শর্মা ওরফে ফোর টোয়েন্টি। সে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী। পূর্বে সে ছিল চটকলের শ্রমিক। চটকলের ম্যানেজার গোরা সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহ করেছে। শ্রমিকদের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। একদা চটকলের মালিক গোরাসাহেব বিদ্রোহী গোবিন্দকে কারখানা থেকে ছাটাই করে। তিন মাস সে জেলও খেটেছে। প্রতারিত প্রতিবাদী গোবিন্দকে শঙ্কিত পুলিশ গৃহচ্যুত করে। সে চটকল অঞ্চল থেকে, শ্রমিক অধ্যুষিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যায়। বেঁচে থাকার তাগিদে কাজের সন্ধানে চটকলের অঞ্চল ছেড়ে ডায়মণ্ডহারবার থেকে তিনসুকিয়া, নোয়াখালি থেকে পশ্চিমের কয়লাখনিতে ঘুরেছে। দশ বছর বাদে সে আবার নিয়তির তাড়নায় জন্ম ভিটেতে আসে। ভাগ্যের পরিহাসে মহামারী মন্বন্তরে স্ত্রী-পুত্র সকলকে হারিয়ে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছে। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে ফোর টোয়েন্টি ছদ্মনামে এই বস্তিতে ছুতোর থেকে রাঁধুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন — "ভবঘুরে জীবনের থিতু হওয়া সময়টুকুর মধ্যে তার নাটকীয় পরিক্রমণ যেন সমরেশের নিজেরই ব্যক্তিজীবনের ভাবরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। গোবিন্দের চোখ দিয়েই এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলো একে একে অনাবৃত হয়েছে।"[১৮] গোবিন্দ অর্থাৎ ফোর টোয়েন্টি দেখেছে বস্তির লোকেদের দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, দেখেছে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও তৃষ্ণাকে।

বস্তির মালিক বাড়িওয়ালার অনেক স্বপ্ন। সে এই নোংরা বস্তিকে পরিণত করবে পাকা দালানে, থাকবে পাকা পায়খানা, জলের কল। বস্তির অনেকে সময়মত ভাড়া দিতে পারে না। তবুও সে তাদের তাড়িয়ে দেয় না বস্তি থেকে। অন্য বস্তিতে যারা অর্থের অভাবে স্থান পায়নি, তাদেরও বাড়িওয়ালা স্থান দিয়েছে। জড়িয়ে পড়েছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখে। গোবিন্দর মত বস্তির মালিকের জীবনের অতীত ইতিহাস আছে। শোষণকারী জমিদারের হাতে খুন হতে দেখেছে নিজের বাবাকে, আশ্রমের সাধুদের হাতে লাঞ্ছিত ও যৌন নির্যাতিত হতে দেখেছে নিজের মাকে। নিজেও সে যৌন নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। সে নিজের জীবনে কিছুই পায়নি, তবু সে সবার শুভাকাঙ্ক্ষী। লেখক সমরেশ বসু জীবিকার তাগিদে নববিবাহিত বধূ গৌরীকে নিয়ে বস্তির অন্ধকার ঘুপচির স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেছেন। আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা পেয়েছেন মাস্টারমশাই অর্থাৎ সত্যভূষণ মজুমদারের কিন্তু বাড়িওয়ালা নিজেই এই বস্তির ভূয়ো মালিক। অপর বাড়িওয়ালা বিরিজামোহনসহ অন্য বাড়ির মালিকরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাকে এই বস্তি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। নায়ক গোবিন্দ এই বস্তিতে রাঁধুনির কাজ করে। বাড়িওয়ালার মতো বস্তির ভাড়াটিয়াদের সুখে-দুঃখে, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে সে যেমন জড়িয়েছে; অনুরূপভাবে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে, প্রতারক ঠক শোষণকারী বাড়িওয়ালা বিরিজামোহনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে সে।

এই বস্তিতে বাস করে লোটন বউ, নন্দ ও হরিশ। চটকলের শ্রমিক লোটনের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী, তার ভাই নন্দ ও হরিশের সঙ্গে একত্রে বাস করে। নন্দ ও হরিশ নিত্য ঝগড়া করে, বিবাদ করে। লোটন বউ নীরবে তা উপভোগ করে। বাড়িওয়ালা তাদের বিবাদ থামানোর চেষ্টা করে। নায়ক গোবিন্দ দুই ভাইয়ের ঝগড়ার প্রতিবাদ করে। সে লোটনবউয়ের ভূমিকা ও আচরণ মেনে নিতে পারে না। এর ফলে লোটনবউ আবার রেগে যায় গোবিন্দর উপরেই। সে বাড়িওয়ালাকে বলে এরা (নন্দ ও হরিশ) আমার কেউ না, ওরা জাহান্নামে যাক; অথচ এই লোটনবউ নন্দ ও হরিশকে নিয়ে একঘরে রাত্রি যাপন করে। তাদের প্রতি লোটনবউয়ের কখনও বিদ্বেষের আবার কখনও প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক। সে ঝগড়া-বিবাদ, কলঙ্ক, লজ্জা, ভয় সব ভুলে ওদের শয্যাসঙ্গী করে। লোটনবউ গর্ভবতী হয়। বস্তির লোকেরা লোটনবউয়ের গর্ভের অবৈধ সন্তানকে মেনে নেয় না। তারা বলে এ হল সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধের জরিমানা হিসাবে লোটনবউকে বস্তিতে ভোজ দিতে হয়েছে। অথচ এই লোটনবউ আবার গোবিন্দকে দোস্ত বলে স্বীকার করেছে। সে দোস্ত গোবিন্দকে বলেছে ওরা (নন্দও হরিশ) বিবাদ না করলে সে সুখী। ওরা দুজনে লোটনবউয়ের প্রেমিক ও প্রিয়তম। লোটনবউ বলেছে তার গর্ভের সন্তান তাদের তিনজনের। চটকলের ছাঁটাই শুরু হলে বস্তির অন্য শ্রমিকদের মতো নন্দ ও হরিশ বেকার হয়ে যায়। কর্মহীন হয়ে তাদের নিত্যদিনের বিবাদ আবার বেড়ে যায়। লোটনবউ নিজের গর্ভের সন্তানকে রক্ষার জন্য বস্তি ছেড়ে পালিয়ে যায়। নন্দ ও হরিশ তার সন্ধানে তৎপর হয়।

কালোর জীবনের সঙ্গে গোবিন্দের জীবনের সাদৃশ্য আছে। কলোরও দোস্ত গোবিন্দ। গোবিন্দর বাবা-মা- স্ত্রী ছিল, তার সংসার ছিল, অনেক আশা ছিল। কালোও দুবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় তার স্ত্রী-সন্তান কাজের সন্ধানে চটকলে গেছে। কিন্তু আর ফিরে আসে নি। সে আজ নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ। যেমন গোবিন্দ নিঃস্ব- নিঃসঙ্গ। সমালোচক জহর সেন মজুমদারের মতে — "একদিন গোবিন্দরও গার্হস্থ্য জীবন ছিল, যা আজ আর নেই। বিবাহিত জীবনের স্বাদে ভরপুর হয়ে গোবিন্দ প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতায় ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের সেই স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়নি। হঠাৎ তার বৌ ছেলে মেয়ে সবসুদ্ধ 'গায়েব' হয়ে যায়। গোবিন্দ এভাবেই প্রতারিত হয়েছে তার নিজেরই সংসার জীবনে। আর এই প্রতারণাই তাকে এই পথে নামিয়েছে।"[১৯] কালো নতুন করে এই বস্তিরই ফুলকির প্রেমে পড়েছে,

তাকে ভালোবেসেছে। নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে। তাকে জীবনসঙ্গী করতে চায় সে। ফুলকি শিক্ষিত অর্থশালী ভদ্র পরিবারের মেয়ে ছিল। সে প্রেমিককে হারিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরেছে। শেষে রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে এই বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে সে। বস্তির সকলে চাঁদা তুলে অসুস্থ ফুলকিকে সুস্থ করেছে। বস্তির সকলে তাকে ভালোবেসেছে, সেবা শুশ্রূষা করেছে। কালো ফুলকিকে প্রেমযোগিনী বলে। ফুলকি রোজ চটকল থেকে ফিরে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকে। প্রেমিক কালো গভীর রাতে নিঃশব্দে সবার অলক্ষে তাকে ভাত খাইয়ে আসে। আবার এই ফুলকি আঘাত করে কালোর চোখ রক্তাক্ত করে দেয়। তবু কালো তাকে না ভালোবেসে পারে না।

চটকলের শ্রমিক নগেন ফুলকিকে চটকলে কর্মের সংস্থান করে দিয়েছে। বাড়িওয়ালা আশ্রয় দিয়েছে তার বস্তিতে। বস্তির সকলের সে ছিল প্রিয়। কিন্তু ফুলকির ব্যভিচারকে নগেন মেনে নিতে পারেনি। ফুলকি চটকলের মালিক সাহেবের কুটিরে প্রায়ই রাত কাটায়, রঙিন কাপড় পড়ে সে বস্তিতে আসে। নগেন তাকে বলেছে কুলটা, চরিত্রহীন। ফুলকির কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও প্রেমিক কালো ফুলকির নামে অপবাদ কলঙ্ক মেনে নিতে পারে না। তাই সে প্রতিবাদ করে নগেনকে বলেছে — ফুলকি সাহেবের ঘরে ঝিয়ের কাজ করতে যায়। নগেন তার যুক্তিকে মেনে নেয়নি। প্রচণ্ড ক্রোধে সে কালোকে আঘাত করে নর্দমার পাঁকে ফেলে দেয়। ফুলকি নগেনকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেয়। নগেন রেগে ফুলকির উপর হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। নগেনের সঙ্গে বস্তির অনেকে ফুলকিকে আক্রমণ করেছে। ফুলকি বিবস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বস্তির উঠোনে আর্তনাদ করতে থাকে। নগেন ফুলকির চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে বস্তির সকলকে তার বিবস্ত্র শরীর তথা সেল সাহেবের কাছে বিক্রিত দেহটা দেখায়। ফুলকির উলঙ্গ শরীরে বস্তির কেউ ছুড়ে দেয় পাঁক, কেউ দেয় ধুলো, কেউ বা দেয় শুধু জল। তার কুৎসিত রূপ দেখে সকলে যখন আনন্দ উপভোগ করেছে, তখন গোবিন্দ ফুলকিকে হিংস্র নগেনের হাত থেকে রক্ষা করে। ফুলকির উপর যারা শারীরিক অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে গোবিন্দ প্রতিবাদ করেছে। পাল্টা আক্রমণ করেছে সে নগেনকে।

ফুলকি অপমানিত ও নির্যাতিত হয়ে এই বস্তি ছেড়ে অন্য বস্তি চলে যায়। ফুলকির সঙ্গে এই বস্তি ছেড়ে চলে যায় প্রেমিক কালোও। তারা আশ্রয় নেয় বিরিজামোহনের বস্তিতে। সেই বস্তি ছিল আরো

নোংরা, ভয়ঙ্কর পাঁকে পরিপূর্ণ। ফুলকিকে শারীরিক নির্যাতনের জন্য গোবিন্দ নগেনকে শারীরিক আঘাত করেছিল। আবার এই গোবিন্দ রাতে নগেনের ব্যথা ভরা শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। অন্যায়ভাবে ফুলকিকে নির্যাতন করার জন্য নগেনও আজ অনুতপ্ত । চটকলের ছাঁটাই শুরু হলে সে কর্মহীন হয়ে পড়ে। নগেন তার জীবনের অস্থায়ী সম্পত্তি লোটা কম্বল নিয়ে এই বস্তি ছেড়ে চলে যায় নতুন করে কাজের সন্ধানে। গোবিন্দের ফুলকির ঘরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে বচসা হয়েছিল। নগেন বস্তি ছেড়ে যাওয়ার সময় গোবিন্দকে বলেছে অতীতের তিক্ততা ভুলে যেতে, স্বীকার করেছে গোবিন্দর ভালোবাসাকে। সে কোনদিন তাকে ভুলতে পারবে না। গোবিন্দকে সে এও বলে যায় যে, ফুলকি যেন তাকে ক্ষমা করে।

অন্যদিকে চটকলের সেল সাহেবের মেম বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। সাহেব ফুলকিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফুলকি কাল রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কাল রোগাক্রান্তা ফুলকিকে বিরিজামোহনের বস্তির সকলে ঘৃণা করে। তাদের ঘরে কেউ আসে না। শুধু প্রেমিক কালো দিনরাত তাকে সেবা শুশ্রূষা করে। সে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে রোগগ্রস্ত ফুলকি ক্রমশ মৃত্যুর পথে এগিয়ে য়াচ্ছে। তবু সে আশাবাদী। কালো তাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ফুলকি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায় না। ফুলকির মৃত্যুর পর কালো তার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করে। তাকে স্নো-পাউডার, আলতা-কাজল দিয়ে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়। সমগ্র বস্তির বাধা অতিক্রম করে ফুলকির শেষ যাত্রায় কালোর সঙ্গী হয় গোবিন্দ। কালো ভালোবাসার আপনজন ফুলকিকে হারিয়ে আবার নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ হয়ে গোবিন্দের সঙ্গে এই বাড়িওয়ালার বস্তিতে ফিরে আসে। লেখক দেখিয়েছেন এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রতিনিয়ত প্রতারিত হয়েছে। বস্তির নৃশংস নোংরা পরিবেশে তারা একত্রে বসবাস করেছে। নিত্য বিবাদ করেছে, অথচ তারাই আবার একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফুলকি ও কালো বস্তির কদর্য পরিবেশে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও একে অপরকে ভালোবাসে। মরণ রোগগ্রস্ত ফুলকিকে কালো বস্তির সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে উপেক্ষা করে সেবা করেছে, ভালোবেসেছে। নব বসন্তের উতলা হাওয়ায় হোলির উৎসবে বস্তির সকলে যখন আনন্দে মুখর ও উন্মত্ত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি তখন চিরতরে বিদায় নেয়। তার শেষ ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা মতো স্নো-পাউডার-আলতা-কাজল প্রভৃতি প্রসাধনে রাঙিয়ে অশ্রুসজল চোখে প্রেমিক কালো বিদায় জানায়। এর মধ্যে দিয়ে বস্তির মানব মানবীদের রোমাণ্টিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের বসন চরিত্রের সঙ্গে ফুলকি চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বসনের মতো তার একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বসন চরিত্রের মধ্যে যে আদিম জৈবিকতা ও প্রেমের সমন্বয় দেখা যায় তা প্রত্যক্ষ করা যায় ফুলকি চরিত্রের মধ্যেও। নিতাইয়ের সংস্পর্শে এসে বসনের ভালোবাসার মনটি জেগে ওঠে, অনুরূপে কালোর ঘনিষ্ঠতায় ফুলকির হৃদয়ে জেগে ওঠে ভালোবাসা। বসনের মতো ফুলকির রূপ যৌবন অনাচারে ও ব্যাভিচারে ম্লান হয়ে যায়।

এই উপন্যাসের অপর চরিত্র গণেশও বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ করেছে চটকলের মালিকের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদী গণেশ আধপেটা রেশনের ভুখা হরতালের সময় সাহেব ম্যানেজারকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। ভুখা আন্দোলনের সে নেতৃত্ব দিয়েছে। সাহেবকে অপমানিত করার অপরাধে সে তেরো দিন জেল খেটেছে। গণেশ ও তার স্ত্রী দুলারী দুর্দিনে বস্তির সকলের পাশে দাঁড়িয়েছে, অর্থ সাহায্য দিয়েছে, ভালোবেসেছে। গণেশের স্ত্রী দুলারী অসুস্থ হলে গণেশ কলে যাওয়া বন্ধ করে অসুস্থ স্ত্রীকে শুধু সেবা যত্ন করে। গোবিন্দ মৃত্যুপথযাত্রী দুলারীকে নতুন করে বাঁচার আশা দেখিয়েছে। গোবিন্দের সেবা শুশ্রূষায় সে ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠে। বস্তির বৃদ্ধা সদীবুড়ি নিজের হাতে গঙ্গার মাটি দিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে দুলারিকে। গায়ে সরষের তেল মাখিয়ে, চুল বেঁধে দিয়েছে তার। সুস্থ দুলারী আবার নিজের হাতে শাড়ি পরতে পারে। গণেশ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। গোবিন্দ নতুন করে তাদের মধ্যে সঞ্চার করেছে জীবনীশক্তি। ছুতোর থেকে বস্তির মানুষ সকলেই তার আপনজন। সে বস্তিবাসীর মনে জাগিয়েছে প্রেরণাশক্তি। জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী সৈনিক গণেশ অসুস্থ স্ত্রীর খাটিয়ার পাশে ভূতের মতো চুপচাপ বসে থাকে। বস্তির সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে রোদ বাতাস প্রকৃতি থেকে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে বদ্ধ ঘরে। গোবিন্দ অসুস্থ দুলারীকে মুক্ত আকাশের নীচে শুইয়ে দিয়ে গণেশকে বলেছে — এই আকাশের তলায়, এই রোদের হাওয়ায়, দরকার হলে মাঠের ধারে তাকে রেখে আসবে সে। গোবিন্দ প্রেরণা দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, ভরসা জুগিয়েছে গণেশ ও দুলারীকে। সমালোচক তাই এই প্রসঙ্গে বলেন — "রোগগন্ধপূর্ণ অন্ধকার ঘরে গোবিন্দ যেনবা ঢুকলো স্বয়ং আলো হয়ে। মন্ত্র দিলো বাঁচার। সেই মন্ত্রে গণেশ আবার নিজেকে ফিরে পেয়ে বুঝলো — বাইরের সংগ্রামী জীবনটাই তার একমাত্র জীবন।"[২০] আবার সে চটকলের কাজে যায়। চটকলে নতুন করে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। গণেশ অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাইকে সমর্থন করেনি। সে বিদ্রোহ করে কোম্পানির

বিরুদ্ধে। গণেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। আবার তাকে জেলে যেতে হয়। এই সংবাদ পেয়ে দুলারী কান্নায় ভেঙে পড়ে। মানবপ্রেমিক গোবিন্দ তাকে সান্ত্বনা দেয়। গণেশ আবার ফিরে আসবে জেল থেকে — এই ইতিবাচক কথাই সে তাকে শোনায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন — "প্রেম ও সংগ্রামের দ্বৈতসত্তা গণেশ চরিত্রটি। ঘরে ও বাইরে তার সমান আকর্ষণ। মরণজয়ী প্রেমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় কখনও সে জীবন-সংরক্ত, আবার কখনও বা শ্রমিকদের বিপজ্জনক আন্দোলনে প্রথম সারির লড়াকু সৈনিক।"[২১] গণেশ শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের প্রতীক। তাই সে প্রেম ভালোবাসাকে অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শোষণের বিরুদ্ধে।

এই উপন্যাসে দেখি বস্তিতে লালিত অসুস্থ রুগ্ন ছেলেটির অনেক আশা। স্বপ্ন দেখে সে, চটকলের মাকি সাহেবের সঙ্গে বিলেত যাবে। বিলেতে গিয়ে বড় মিস্তিরি হবে। মেমসাহেবকে বিয়ে করার অলীক স্বপ্ন দেখে। নিজে নিজেই সে ছড়া কাটে ঃ

"মাকি সায়েব, মাকি সায়েব, বিলেত চলেছে,
ডানা কাটা পরী মেম, সঙ্গে চলেছে।"

রুগ্ন ছেলেটির বাবা মদ্যপ অবস্থায় তার মাকে শারীরিক পীড়ন করে। তার মা সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। কিন্তু রুগ্ন ছেলেটি পিতার অন্যায় অত্যাচার মেনে নেয়নি। সে প্রতিবাদ করেছে মদ্যপ পিতার আচরণের বিরুদ্ধে। রুগ্ন ছেলেটি তার পিতাকে মেরে ফেলতে চায়। তার মা অসুস্থ রুগ্ন সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে হতাশা ও চরম দারিদ্র্যের গ্লানিময় জীবনকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে। গোবিন্দকে সে বলত ফোর টোয়েন্টি চাচা। রুগ্ন ছেলেটির মা গোবিন্দকে দেখার দায়িত্ব দিয়েছিল। তাকে গোবিন্দ শত চেষ্টায় বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে। ছেলেটির মা ক্ষোভে দুঃখে ও হতাশায় গোবিন্দকে 'যম' বলে অপবাদ দিয়েছে। অথচ এই রুগ্ন ছেলেটির মা আবার বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গোবিন্দ খুন হলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের কাছে খুনির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের অপর চরিত্র মাদারি। সে বিষহীন সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। মাজে মাঝে সে ভুল ইংরেজিতে কথা বলে। অজ্ঞাত পরিচয়হীন মাদারি বস্তিতে বাজিকর বলে পরিচিত। সদা খুশি সে। বস্তিতে যখন একে অপরকে অপবাদ দেয়, পরস্পর ঝগড়া কলহে মও হয়, তখন সে আনন্দে ডুগডুগি বাজায়। চিৎকার করে করে বলে 'ইস্টাপ, ইস্টাপ, ডোণ্ট হট, তব ফট্‌হো যায়েগা। মাই-অ-ড-

র।' ক্ষুধার্ত অর্ধ উন্মাদ মাদারি রাঁধুনি গোবিন্দর কাছে সাপের জন্য ভাতের ফ্যান চেয়ে নিয়ে শুধু মাত্র নুন দিয়ে নিজে খেয়ে নেয়। গোবিন্দ তার ক্ষিদের যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে গোপনে ফ্যানের মধ্যে একমুঠো ভাত ফেলে দিত। সেই ভাত সে তৃপ্তি করে খেত। অথচ এই মাদারি রাঁধুনি গোবিন্দর বিরুদ্ধে ভাত নষ্ট করার অভিযোগ করে ও অপমান করে। মাদারিকে সমর্থন করে বস্তির অনেকে গোবিন্দর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছে।

অপর চরিত্র সদীবুড়ি বস্তির সকলকে ভালোবাসে, সে বাড়িওয়ালাকে শৈশব থেকে চেনে। বাড়িওয়ালা জীবনযুদ্ধে বার বার পরাজিত হয়েছে। সে নোংরা, ক্লেদাক্ত, পাঁকে পরিপূর্ণ বস্তিকে পাকা বাড়িতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে। ভূয়ো মালিকানার বস্তিকে নিয়ে অবাস্তব স্বপ্ন দেখে বলে সদীবুড়ি তাকে পাগল বলে। এতে বাড়িওয়ালা তার উপর ক্ষেপে যায়। অপর বাড়িওয়ালা শোষণকারী বিরিজামোহন বস্তির বাড়িওয়ালাকে বাড়ির মালিক বলে সম্বোধন ক'রে অপমান করে, উপহাস করে, এই বস্তির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে ভয় দেখায়। অথচ এই সুদী বুড়িই যখন বিরিজামোহনকে নোংরা কাদা ছুঁড়ে বস্তি থেকে সকলে তাড়িয়ে দেয়। তখন বস্তির মালিকের দুঃসময়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। সমালোচক বলেছেন — "একদিন কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে বিরিজামোহন বস্তির চত্বরে প্রবেশ করলে মরিয়া বস্তিবাসীরা তার চরম নাকাল করে ছেড়েছিল। শুধু ধুলোবালিই ছোঁড়া নয়, তাকে দুর্গন্ধ কাঁচা নর্দমার পাঁকে ফেলে দিয়েছিল। এ শুধু একজন বিরিজামোহনের বিরুদ্ধেই নয়, শোষক অত্যাচারী কায়েমী সমাজের বিরুদ্ধে যেন এক গর্জিত প্রতিবাদ।"[২২] আপাত রুক্ষ এই বাড়িওয়ালার কোন ক্ষমতার মোহ নেই, বস্তিবাসীরা তাকে 'হুজুর বলে' ডাকলে সে রেগে যায়। আবার অপর বাড়িওয়ালা বিরিজামোহনের সামনে লোক দেখানো ক্ষমতা জাহির করার জন্য গোবিন্দকে আদেশ দেয় তাকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করতে। বস্তির মালিককে যখন বিরিজামোহন অপমান করে সদীবুড়ি তা মেনে নিতে পারেনি, প্রতিবাদ করেছে সে। এই প্রসঙ্গে দুজন সমালোচকের মতামত দেওয়া যেতে পারে। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত — "বিরিজামোহনের গায়ে তারা যখন কাদা ছোঁড়ে, ময়লা ছোঁড়ে তখন এই মনুষ্যত্বই কথা বলে; এ কাদা শুধু একজন বিরিজামোহনের দিকেই ধাবিত নয়, এ কাদা উদ্যত সমাজের দিকে, শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে।"[২৩] সমালোচক প্রসূন ঘোষের মতে — "বস্তিবাসী নর নারীর কাছে সমাজ-বন্ধন প্রত্যাশিত নয়, নৃশংস বাস্তবতার মুখোমুখি হতে গিয়ে মধ্যবিত্ত অর্থবান বিরিজামোহনের মতো ব্যক্তিকে তারা নোংরা কাদা অথবা বস্তির ময়লা জঞ্জালই ছোঁড়ে। এ ঘটনাও যেন প্রতীকি তাৎপর্য পেয়ে

যায়, এ যেন মধ্যবিত্ত নরনারী সৃষ্ট সমাজের প্রতি, সামাজিক বন্ধনের প্রতি, সুবিধাভোগী মানুষদের গড়ে তোলা ব্যবস্থার প্রতি, বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত মানুষদের জমে থাকা তীব্র ঘৃণার প্রকাশ।"[২৪]

বস্তির মালিকের অনেক স্বপ্ন, অনেক আকাঙ্ক্ষা। সে বস্তির সকলের সুখে ও দুঃখে পাশে থাকে, তাদের যন্ত্রণার অংশীদার হতে চায় সে। বস্তির অনেকে নিয়মিত তাকে ভাড়া দেয় না। তবুও সে তাদের বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেয় না। সে নিজেকে রামের সঙ্গে তুলনা করে। পিতা যেমন সন্তানকে পালন করে সেও তেমনি বস্তির সকলকে স্নেহ করে, ভালোবাসে। নন্দ ও হরিশ নিত্য বিবাদ করলেও তাদের সে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেয় নি। ফুলকি, লোটনবউ প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্ক জ্ঞাত হয়েও সে তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

বস্তির মালিক যখন দেখে যে বস্তির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সে গোবিন্দকে বস্তির মালিকানা রক্ষার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। জমিদারের হাত থেকে বস্তিকে রক্ষা করার মধ্যে শুধু বাড়িওয়ালার স্বার্থ নেই, স্বার্থ জড়িয়ে ছিল বস্তির সকলের। গোবিন্দ বস্তিকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে উকিলের পরামর্শ নিয়েছে, বস্তিকে রক্ষা করতে কলকাতা থেকে ব্যারিষ্টার পর্যন্ত এনেছে। একদিকে বস্তি উচ্ছেদে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে, অপরদিকে চটকলে শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই। চটকলের ছাঁটাই নিয়ে বস্তির সকলে উদ্বিগ্ন হয়। শ্রমিক ছাঁটাইয়ে বস্তির প্রায় সকলে কর্মহীন বেকার হয়ে পড়ে। তারা আবার নতুন করে কাজের সন্ধান করে, কেউ যায় জুট কারখানায়, কেউবা কাঠের গোলায়, কেউ রিক্সা মালিকের দ্বারে। প্রতিবাদী সংগ্রামী গণেশ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রে গ্রেপ্তার হয়, জেলে বন্দী হয়। বাঙালি জমিদার ও বিরিজামোহন চক্রান্ত ক'রে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে বস্তিকে উচ্ছেদ করে। বিরিজামোহন মিউনিসিপ্যালিটি হেলথ অফিসার ও স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের সহযোগিতায় গোপনে রাতের অন্ধকারে নোংরা ময়লা ও রাবিস ঢেলে দেয় বস্তিতে। সেখানে অন্যায়ভাবে নোংরা ময়লা ফেলার জন্য গোবিন্দ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমুখর হয়ে ওঠে। অপমান করে অফিসারদের, বিরিজামোহনকে থাপ্পড় মারে। মামলার রায়ে গোবিন্দ তথা বাড়িওয়ালা পরাজিত হয়। বস্তি খালি করে দিতে আদালত নির্দেশ দেয়। গোবিন্দ আদালতের অন্যায় রায় মেনে নিতে পারেনি। জমিদার দখল নিতে এলে গোবিন্দ বিভ্রান্ত হয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিরোধ করে, ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। চোরাগোপ্তা ছুরির আঘাতে খুন হয় সে।

গোবিন্দের মৃত্যুতে বাড়িওয়ালা গভীর শোকে ও হতাশায় বলেছে — আমি আসল ফকির বনেছি। সে জীবনের চরমতম সত্য উপলব্ধি করেছে — জমিদার পাটোয়ারী পথে বসিয়েছে শুধু তাকে ও তার পরিবারকে। বিরিজামোহন পথে বসিয়েছে গোটা বস্তিবাসীকেই, এই বস্তিকে নিয়ে সে অনেক আশা ও স্বপ্ন দেখেছিল। গোবিন্দকে বলেছিল "আমি যদি শালা মানুষের বাচ্চা হই, এক আধলাও ছাড়ব না। আর পায়খানা আমি করবই, জল কলও আনবই। দেখি কে আমাকে রোধে।" এই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের অতৃপ্ত স্বপ্নগুলো গোবিন্দর মনেও অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই সে ক্ষমতাশালী উচ্ছেদকারী বিরুদ্ধপক্ষের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি প্রশ্ন নিয়ে — "এত গুলি লোক কোথায় যাবে।" মানব বান্ধব বিপ্লবী গোবিন্দ চটকল থেকে, বস্তি থেকে এবং শেষে পৃথিবী থেকে ছাঁটাই হয়। তার মৃত্যু এক প্রতিবাদী বিপ্লবীর অসমাপ্ত কর্মপ্রতিভার ট্রাজিক পরিণাম। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের মত এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় — "বস্তি উচ্ছেদের লড়াইয়ে উপন্যাসের নায়ক ছুরিকাহত হয়। কিন্তু সেই মৃত্যু নির্জীব ক্লীবের মৃত্যু নয়। এক অনুমেয় ট্র্যাজেডির সে মহানায়ক।"[২৫]

নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের মতে ম্যাকসিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের মা চরিত্রের সঙ্গে এই উপন্যাসের বিপ্লবী গোবিন্দের সাদৃশ্য আছে। 'মা' উপন্যাসের মাদার মেহনতি মানুষের বিপ্লবী নেত্রী। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা পুলিশ বাহিনী মাকে হত্যা করে কাপুরুষের মতো। বিপ্লবী গোবিন্দকে বিরিজামোহন ও জমিদাররা কাপুরুষের মতো খুন করেছে। 'মাদার' উপন্যাসের মায়ের মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয়। গোবিন্দর মৃত্যুও নির্জীব মৃত্যু নয়। সে নির্মম বাস্তবতার সন্মুখীন হয়েও জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। লড়াইয়ে সে ছুরিকাহত হয়েও অপরাজিত। এই উপন্যাসে লেখক সমরেশ বসুর শোষিত সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। এই বস্তির কেউ প্রেমিক, কেউ গায়ক, কেউ ইন্দ্রিয় লালসা মও; কেউবা বাজিকর। মৃত্যু পথযাত্রী শিশুও স্বপ্ন দেখে বিলেতে গিয়ে সাহেব হবে, মেম সাহেবকে বিয়ে করবে। বাড়িওয়ালাও স্বপ্ন দেখেছিল ঃ বস্তিতে পাকা পায়খানা তৈরি করবে, জলের কল বসাবে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবে, ছাটাই কর্মহীন শ্রমিকদের চাকরি দেবে। প্রত্যেকে নিম্নবিত্ত, প্রত্যেকের সমস্যা দারিদ্র্য। সর্বোপরি নায়ক গোবিন্দ বস্তিবাসীদের Friend, Philosopher and Guide। সেই গোবিন্দের অপরাজেয় সংগ্রামী সত্তাটিই সমরেশ বসু এ উপন্যাসে বারে বারে দেখিয়েছেন। ❑

৪

সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটির সময়কাল ১৯২০ - ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। উপন্যাসটি লেখক সমরেশ বসু রাজনৈতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র রয়েছে ঃ "সময়টা উনিশশো বাইশ সালের বসন্তকালের শেষ দিক। সারা দেশটা যেন একটা বিরাট ছাইয়ের ভস্মস্তূপ হয়ে আছে। ছাইরের স্তূপটা বিলিতি কাপড়ের। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, জাতীয় আন্দোলনের নিভানো চিতার ছাই প্রদেশ জেলায় ছড়িয়ে যেন একটা ধূসর আবছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বোঝা যায় না সেই ভস্মস্তূপের তলায় আগুন চাপা পড়ে আছে কি না। আর জায়গায় জায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ।" সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি ভাটপাড়া, আতপুর, জগদ্দল অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে লেখক নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক নৈহাটি স্টেশনের পাশে 'বাসন্তী কেবিন'কে কেন্দ্র ক'রে রচনা করেছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি — "নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনের সামনেই বাসন্তী কেবিন। এ কালের নৈহাটির একমাত্র উজ্জ্বল রেস্তোরাঁ। একে ঘিরেই সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে' - উপন্যাসে কল্পনা মঞ্জুরিত হয়েছে। কিন্তু এই রেস্তোরাঁটির নৈহাটি স্টেশন-পর্বের আগে একটি আদি পর্ব ছিল।"[২৬] ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপ্লবীদের আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসে অর্থাৎ শ্রীমতী কাফে রেস্তোরাঁয় লেখক রাজনীতির তিনটি মতাদর্শ — গান্ধীবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজম (গণ আন্দোলন)কে উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভজন হালদার ওরফে ভজু বা ভজুলাট 'শ্রীমতী কাফে' রেস্তোরাঁর মালিক। মহাদেব হালদারের দুই পুত্র নারায়ণ হালদার ও ভজন হালদার। ভজু কনিষ্ঠ। মহাদেব হালদার ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা লড়ে পরাজিত হয়ে আজ প্রায় সর্বস্বান্ত। জীবনে উনিশটি মামলার পরাজয়ের গ্লানি বহন ক'রে হতাশ ও নিরাশ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। "বসত বাড়িটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে

না। আজ যে জমির মামলায় তার পরাজয় হল, সে জমিটুকুর দাম তিনি পাবেন।" মহাদেব হালদার সংসারের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তার নেশা ছিল অত্যধিক মদ্যপান ও পেশা ছিল ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা। জীবনের শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু তাঁর ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে চলে যায়। পরাজিত মহাদেব পুত্র ভজুকে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা লড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ভজুর বাবার আদর্শ ও পেশার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কোনটাই নেই। ভজুর বিশ্বাস মহাদেব হালদার একদা জমিদারের নায়েব থাকাকালীন বহু কৃষককে প্রতারিত করেছেন, পথে বসিয়েছেন। ভজু ও নারায়ণ উভয়ে শিক্ষিত। ভজু সদ্য বি. এ. পাশ করেছে। বাবার সঙ্গে ভজুর চরম মতবিরোধ। "সে বিরোধ মহাদেব হালদারের সংসারের বিমুখতা। তাছাড়া অত্যধিক সুরাসক্তিতে তিনি নিমজ্জমান। অর্থাৎ এ সংসারের দিকে তিনি কোনও দিন ফিরে তাকাননি উপরন্তু যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেটা একটা অতল গর্ভের খাদের ধারে।" নারায়ণ হালদার সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা বিপ্লবে যোগ দেয়। মাসখানেক হল সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ভজু সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করবে না। "এখানকার কোন চটকল বা অন্য কোনও বেসরকারি কারবারে তার চাকরি হতে পারত।" ভজুর স্থির সিদ্ধান্ত সে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি অর্থাৎ ও সব ছ্যাঁচড়া কাজের জন্য সে জন্মগ্রহণ করেনি। প্রচুর টাকাও তার নেই যে সে বড় ব্যবসা করবে। স্থির করে সে চায়ের দোকান করবে। দুপয়সা কাপ চা বিক্রি করে ভজুর কর্মজীবন শুরু হয়। সংসারে দাদা নারায়ণের প্রতি ছাড়া আর কারো প্রতি ভজুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নেই। সমস্ত কিছুতেই ভজুর অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা। শুধু দাদা নারায়ণের কাছে নিজের প্রাণটাও অতি তুচ্ছ। অথচ দাদার বিপ্লবের পথ সে অনুসরণ করেনি। তার মতে — "ওটা একটা বৃথা কাজ, পাথরের দেওয়ালে অকারণ মাথা ঠোকা। যে কারণে সে সাধু হবে না, সে কারণেই সে হবে না বিপ্লবী।" ভজু স্বাধীন। তাই সে স্বাধীন ভাবে বাড়ির সামনে ছিটে বেড়ার ঘরে গড়ে তোলে চায়ের দোকান — নাম 'শ্রীমতী কাফে'। চা ছাড়াও ঘুগনি, চপ কাটলেট প্রভৃতি পাওয়া যায়। 'শ্রীমতী কাফে'তে সমাজের সর্বশ্রেণির লোকের অবাধ যাওয়া আসা। রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে রেলের সরকারী কর্মচারী ও কুলিমজুররা পর্যন্ত সেখানে যাওয়া আসা করে।

ভজুর 'শ্রীমতী কাফে'তে খদ্দের ছাড়া রাজনৈতিক কর্মীদের আড্ডাস্থল ছিল। হীরেন, কৃপাল, প্রিয়নাথ, রথীন, সুনির্মল এরা প্রত্যেকে রাজনৈতিক কর্মী অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামী। হীরেন গান্ধীবাদী অর্থাৎ গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী। কৃপাল কংগ্রেসী, প্রিয়নাথ কমিউনিস্ট, সুনির্মল রথীন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। এরা সকলে বিপ্লবী নারায়ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। কৃপাল, হীরেন নারায়ণের সঙ্গে জেল খেটেছে। "এরা সকলেই নারায়ণের বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয়। তাছাড়া ভজুর যাকে বলে রেগুলার খদ্দের।" কলেজ জীবন থেকে এরা সকলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। সকলে ভজুর সমবয়সী। রথীন সকলের ছোট, সে শুধু ম্যাট্রিক পাশ করেনি। এদের অভিভাবকেরা ভজুর চায়ের দোকানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এরা গোপনে লুকিয়ে ভজুর দোকানে আসে। বিপ্লবী নারায়ণের নির্দেশে এরা সংগ্রামের কর্মসূচি স্থির করে। 'শ্রীমতী কাফে' স্বাধীনতা বিপ্লবীদের আলোচনার গোপনস্থান। বাঙালি 'শ্রীমতী কাফে'র নিয়মিত খদ্দের। সে রেল ইয়ার্ডের মজুর। অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় সে জর্জরিত। সংসারে তার নিত্য অভাব। বাঙালি অশিক্ষিত কিন্তু প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী। সে জাত প্রথা মানে না। তিলক ঠাকুর নীচু জাতের লোকেদের খড়ম পেটা করতে চেয়েছিল। বাঙালি তিলক ঠাকুরের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে বলেছে — তোমাকে তোমার খড়ম দিয়ে আঘাত করলে কোন ব্রহ্মা এসে রক্ষা করবে। বাঙালির এই অন্যায়ের প্রতিবাদকে ভজু সমর্থন করেছে। ভজু ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তবু সে নিম্নবিত্ত অসংস্কৃত বাঙালিকে ভালোবাসে, সম্মান করে। গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব। বাঙালির নীতিকে ভজু বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে তার প্রতিবাদী আচরণকে। বাঙালি মদের নেশায় আসক্ত। মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়েও ভজুর 'শ্রীমতী কাফে'তে বসে সে নিয়মিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আলোচনা শোনে। শ্রীমতী কাফেতে বিপ্লবী নারায়ণ, হীরেন ও কৃপালদের সংগ্রামের পরিকল্পনা করে। গান্ধীবাদী হীরেন বাঙালির মদ্যপানকে সমর্থন করে না। সে বাঙালিকে বলে বিপ্লবী হতে গেলে নিজেকেও পবিত্র রাখতে হবে। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি — "চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বাসন্তী কেবিনে আমি যাঁদের দেখেছি, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখ করলে এখানকার বিচিত্র সমাবেশের চেহারাটা বোঝা যাবে - বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, নজরুলের বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, জেলার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা চতুর আলি, জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গোপাল বসু।"[২৭]

এছাড়া ছিলেন বিভিন্ন সাহিত্যিক, ছাত্রনেতা, ঔপন্যাসিক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমরেশ বসু। ভজু সংগ্রামী বিপ্লবীদের পথ অবলম্বন না করলেও বিপ্লবীদের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। সে যেমন বিপ্লবীদের তার 'শ্রীমতী কাফে'তে স্থান দিয়েছে, তেমনি আশ্রয় দিয়েছে আগ্নেয় অস্ত্র (রিভলবার) আমদানিকারী আগন্তুক আফিমের স্মাগলারকে। ভজু স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্মী না হয়েও বিপ্লবী সংগ্রামীদের আলোচনা জানার ও শোনার জন্য আগ্রহী। নারায়ণের আদর্শে যেমন হীরেন, রথীন, কৃপাল স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপিত হয়েছে, তেমনি ভজুও তার চায়ের দোকানে দাদা নারায়ণের হাতে কালো চকচকে দুটি রিভলবার দেখে আবেগে আগন্তুককে বলেছে — "সাহেব, তোমার একাজে আমাকে নিয়ে যাও।" নারায়ণের নির্দেশে বিপ্লবী রথীন শ্মশানে সাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে 'শ্রী' লেখা দেখে ভয় পেয়ে চলে আসে। নির্ভীক ভজু রাত্রির অন্ধকারে রথীনের পূর্বে নির্জন শ্মশানে শবের পাশে 'শ্রী' লিখে আসে। ভজু প্রমাণ করে বিপ্লবীদের থেকে সে কম সাহসী নয়। নারায়ণ পূর্বেও ভাই ভজুর সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছে। ইংরেজ সাহেবের গাড়িতে সে ঢিল মেরেছিল, যা বিপ্লবীদের এমনকি নারায়ণের পর্যন্ত সাহস হয়নি। নারায়ণ নিশ্চিত ভাই ভজু শ্মশানে 'শ্রী' লিখে এসেছে। সে জানে ভজুর মতো সাহসী তার দলে কেউ নেই। বিপ্লবী নারায়ণদের ব্রত ইংরেজদের রক্তে এদেশের মাটি লাল করে দেবে। "এ দেশে যতদিন পর্যন্ত একটি ইংরেজও জীবিত থাকবে, ততদিন আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী, গৃহ কিছুই নেই। আমরা মরিব, তবু দেশ শত্রু মুক্ত করিব।" ভজু শ্রদ্ধা করে বিপ্লবী দাদা নারায়ণকে। নারায়ণ যুক্তিবাদী। সে আবেগে অনুপ্রাণিত হয় না। সে গান্ধীবাদ থেকে ক্রমশ সরে এসেছে। গ্রহণ করেছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। (বিপ্লবী নারায়ণ ও প্রিয়নাথ কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী।) গান্ধীবাদী হীরেন বলেছে — নারায়ণ যে এ ভয়াবহ পথে মোড় নেবেন, এটা তারা ভাবতেই পারেনি। এই প্রথম হীরেন ও কৃপাল চোখের সামনে রিভলবার দেখেছে। কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক জীবনে এ পথে আসার কথা তারা কোনও দিন চিন্তাও করেনি। বিপ্লবী নারায়ণও প্রিয়নাথ কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের আন্দোলন নিম্নবিত্ত শ্রমিক মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। তাই হীরেন মদের দোকানে দোকানে পিকেটিং করার প্রস্তাব দিলে নারায়ণ তাতে সম্মত হয়। হীরেন গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী। নারায়ণের কাজ কর্মে সে উদাসীনতা লক্ষ করে। স্বরাজ লাভের অন্য পথ ধরেছে নারায়ণ। "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি গান্ধীজির পথ থেকে নিজেকে

সরিয়ে নিচ্ছেন। এ বড় বেদনার ও দুঃখের কথা। তাদের পথ প্রদর্শক নেতা নারায়ণদা আজ সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ পথে চলেছেন।" সুনির্মল নতুন করে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়।

নারায়ণ বিপ্লবে যোগ দিয়ে বাবা মহাদেবকে হতাশ ও নিরাশ করেছে। ভজুকে নিয়ে সে অনেক আশা স্বপ্ন দেখেছে। মহাদেব হালদার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বলে — "শোনো বড় বউ, আমি ভজুর বে দেব। নারায়ণটা জোচ্চুরির পথ ধরেছে; ও লোক ঠকিয়ে খাবে। কিন্তু ভজু তা নয় ও সংসার চায়। মোটা পণ নে ওকে আমি বে' দেব বুঝলে ? তার পর; ওকে আমি ঠিক আমার রাস্তায় এনে ভেড়াব; তুমি দেখো।" মহাদেব মামলায় পরাজিত ও নিঃসহায় হয়ে গভীর জলে ডুবন্ত মানুষের মতো ভজুকে সে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। ভজুকে বলেছে — "এ সংসারে কাউকে বিশ্বাস করবিনে, তার জায়গা এটা নয়। দেখ, আমাদের এ গাঁয়ে কোন লোকটাকে তুই ভালো বলবি ? কালো চাটুজ্যের দিদি কালোকে খুন করতে চেয়েছিল নুকিয়ে। পয়সার জন্যে আমাদের নারানই তোকে কোনও দিন ফাঁকি দিতে চাইবে।" ভজুকে তার বাবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যর্থ মহাদেব বড় নিঃসঙ্গ। নির্জন ঘরে সে শুধু মদ্যপান করে ঝিমোতে থাকে। বকুলমা ভজু ও নারায়ণের পালিত মা। মহাদেবের স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিধবা বকুলমা ভজু ও নারায়ণের দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। ভজুর মার সই ছিল বকুলমা। সংসারে আপনজন বলতে তার কেউ ছিলনা। শ্বশুরের দেওয়া সোনার অলংকার বিক্রি করে বকুলমা এদের মুখে অন্ন জুটিয়েছে। মহাদেব হালদারকে নিয়ে প্রতিবেশীদের নানা অপবাদ ও মিথ্যা কলঙ্ক নীরবে সহ্য করেছে। ভজু বিয়ের পর সে সংসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। ভজু দাদা নারায়ণের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে। ভজুর বিয়েতে নারায়ণ অনুপস্থিত ছিল। ভজুর স্ত্রীর নাম যুঁই। স্ত্রী যুঁইকে নিয়ে ভজু নতুন করে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বিয়ের ফুলশয্যার রাতে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। ফুলশয্যার রাতে সে বাবা মহাদেবের বোতল থেকে মদ চুরি করে খায়। ভজুর এই অধঃপতন দেখে বকুলমা আত্মযন্ত্রণায় ভোগে। মনে হয় তার সে যেন নিশাচরী প্রেতিনীর মতো অমঙ্গলের ছায়া বহন করে এ বাড়ির কোণে কোণে ঘুরছে। সে পালিয়ে বাঁচতে চায় এবাড়ি থেকে। মদ পান করে ভজু গান গায়। 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।' মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবে — রাত পোহালে সে দোকানে যাবে, স্ত্রী যুঁইকে বলবে ঘুগনি তৈরি করে দাও। কখনো ভাবে যুঁইয়ের টাকায় সে বড় রেস্টুরেণ্ট খুলবে। নাম দেবে যুঁই রেস্তোরাঁ বা যুঁই কেবিন। আবার ভাবে কাফে দ্য যুঁই দিলে ভালো হয়। ফুলশয্যার পরের দিন যুঁইয়ের

সুখের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন এক নরকে এসেছে। তবু সে কাঁদেনি। গভীর রাত্রে সে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বামী ভজুর মুখের দিকে। সন্দেহ জাগে তার মনে স্বামী ভজুর হয়ত তাকে পছন্দ হয়নি। সে তো সব উজার করে দিয়েছে স্বামীকে। ভজুর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন ছিল 'শ্রীমতী কাফে'। নারায়ণের জীবনে কৈশোরে প্রেম এসেছিল। পাঠকবাড়ির মেয়ে প্রমীলা শৈশবে নারায়ণকে স্বামীরূপে স্বপ্ন দেখেছিল। নারায়ণের মনেও রোমাঞ্চ এসেছিল। বিয়ের প্রস্তাবও এসেছিল পাঠক বাড়ি থেকে। মহাদেবের নীরবতায় এ সব কিছুই শান্ত ও সমাপ্ত হয়ে যায়। নারায়ণ দেশমাতৃকার আহ্বানে যোগ দেয় স্বাধীনতা বিপ্লবে। ভজুর বিয়ের পর নারায়ণ কয়েক মাস বাড়িতে ছিল। বাড়িতে সে খুব কম সময় থাকত। সর্বদা ছিল তার মনে বিষাদের ছাপ। সদা উদ্বিগ্ন ছিল সে পরিবারের সকলের প্রতি। বিপ্লবী নারায়ণের সন্ধানে গভীর রাতে ভজুর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি করে। নারায়ণ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রাত দুটো থেকে ভোর, পাঁচটা পর্যন্ত পুলিশ তল্লাশি করে। নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। এর পর নারায়ণ দীর্ঘদিন বাড়ি ফেরেনি। মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর পুলিশ আবার ভজুর বাড়িতে তল্লাশি করে ভোর রাত্রে। ভজু পূর্বে নারায়ণের বিপ্লবী নথিপত্র লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল বোনের আতুর ঘরে। "হালদারের মেয়ে ভজনের বোনের তখন প্রসব হয়েছে। বাড়িতে আঁতুর ঘর। সেই ঘরের কাপড় চোপড়ের মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছিল নারায়ণের পরিত্যক্ত কাগজ পত্র।" ভারতীয় দেশি পুলিশ নারায়ণের খোঁজে আঁতুর ঘরে প্রবেশ করতে সঙ্কোচ বোধ করলেও সাহেব পুলিশ নিঃসঙ্কোচে আঁতুর ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রসূতির বিছানা তল্লাশি করতে চেয়েছিল। বকুলমার তৎপরতায় ও তীব্র আপত্তিতে বিরত থাকে তারা। পুলিশ এবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এতেই পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি, ভজুর 'শ্রীমতী কাফে'তেও তল্লাশি করে। সেখানেও পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। মাঝখান থেকে প্রায় দু-তিনদিন ভজুর চায়ের দোকানে খদ্দের আসা বন্ধ হয়ে যায়। এর পনেরোদিন বাদে ভজু সংবাদ পায় নারায়ণ গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী আছে। বিপ্লবী নারায়ণ চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক সমরেশ বসু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর শাসক ইংরেজ সরকারের অন্যায় ও নির্মম অত্যাচরের চিত্র তুলে ধরেছেন। নারায়ণকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ প্রশাসন ভাই ভজুর চায়ের দোকান অর্থাৎ 'শ্রীমতী কাফে'তে তল্লাশি চাল্লায়, ভাঙচুর করে। তবু তারা ভজুকে দমাতে পারেনি।

নারায়ণ প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকাকালীন ভজুর মানসিকতার পরিবর্তন দেখা যায়। সে দাদার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চায়। "রীতিমতো সমিতিতে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল সে। তার উপর অনেকের বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল তার সাহসিকতার উপর।" রথীন সুনির্মল সহকর্মীর মতো ভজুর নিত্য সঙ্গী হয়। ভজুর চায়ের দোকান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সন্তানের জননী হয়ে যুঁই বাবার বাড়ি থেকে ফিরে ভজুর সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। "শ্বশুর আরও নিস্পৃহ, ভাশুর জেল বন্দী। বকুলমা বিষন্ন ও বিরক্ত। চায়ের দোকান বন্ধ। স্বামী কী এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় ছট্‌ফট্ করে ঘুরছে।" ভজু দোকান থেকে বাঙালির সঙ্গে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। চিৎকার করে সে সকলকে জানায়; সে নীচু জাতের এঁটো খেয়েছে। মদ্যপ ভজুকে মহাদেব নতুন করে মামলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে কয়েকটা নামহীন দলিলের নকল সংগ্রহ ক'রে ভজুকে মামলা করার প্রস্তাব দেয়। আশ্বাস দেয় সে আসল দলিল সংগ্রহ ক'রে দেবে। ভজু শেষবারেও বাবাকে হতাশ ও নিরাশ করে। মহাদেবের দীর্ঘদিনের অন্তরের সুপ্ত গোপন আশা ও স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। ভজু নতুন করে দোকান খোলার জন্য উদ্দীপিত হয়। স্ত্রী যুঁই নিজের সোনার অলঙ্কার দোকানের জন্য ভজুর হাতে নিঃশর্তে অর্পন করে। স্টেশনের উল্টোদিকের রাস্তার পাশে গড়ে উঠে 'শ্রীমতী কাফে'। সাইনবোর্ডে লেখা হয় স্থাপিত ইং ১৯২০ সাল। ভজু নতুন করে সাজায় 'শ্রীমতী কাফে'। 'শ্রীমতী কাফে'তে রয়েছে বিপ্লবী নারায়ণের ছবিসহ দেশবন্ধু সি. আর. দাস, রাফেলের মা ও ছেলে, মেরী মাতা রবীন্দ্রনাথ ও সিরাজদ্দৌল্লার ছবি। সি. আর. দাশের ছবির নীচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতাটি লিখে রাখে —

"এনে ছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

ভজু মদ্যপ, মদের নেশায় সে সর্বদা আচ্ছন্ন। তবু মহামানব ও বিপ্লবীদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। নিজের জীবনের প্রতি ভজুর ছিল অবজ্ঞা ও অবহেলা। কিন্তু নিজে হাতে তৈরি 'শ্রীমতী কাফে'কে নিয়ে তার ছিল গর্ব ও অহংকার। সর্বস্ব দিয়ে সাজিয়েছে রেস্তোরাঁটি। জমে ওঠে শ্রীমতী কাফেতে পূর্বের সান্ধ্যকালীন আড্ডা। শুরু হয় বিপ্লবী হীরেন , কৃপাল, রথীন, প্রিয়নাথ, সুনির্মল প্রমুখদের আসা যাওয়া। ভজু তার 'শ্রীমতী কাফে'তে আশ্রয় দেয় সকলকে। সেখানে আত্মগোপন করে কানপুরের বিপ্লবী সুরজ সিং। রথীন ও সুনির্মল

সুরজ সিংকে শ্রীমতীতে নিয়ে আসে। কানপুর থেকে কিছু রিভলভারের পার্টস নিয়ে এসেছে দলের প্রয়োজনে। "ছোটখাট ছেলেটি, শক্ত শরীরে কলিদার পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা একটা রুক্ষ সহজ সৌন্দর্য রয়েছে তার। নাম তার সুরজ সিং। এসে পৌছাতেই এ অঞ্চল থেকে বেরুবার তার সমস্ত পথ পুলিশ আটকে ফেলেছে।" রাজনৈতিক বিপ্লবীদের আড্ডাস্থল ও সুরজ সিংএর আত্মগোপনের সংবাদ পেয়ে পুলিশ তল্লাশি করতে আসে 'শ্রীমতী কাফে'তে। পুলিশ অফিসার ভজুর চেয়ারে বসতে উদ্যত হলে সে বাধা দেয়। ভজুর নির্দেশে কর্মচারী বিশে অফিসার অন্য একটি চেয়ার এনে দেয়। ভজুর আত্মসম্মানবোধ প্রখর। সে শ্রীমতীর প্রোপাইটারের চেয়ারে বসতে দেয়না। পুলিশ অফিসার এতে অপমানবোধ করে। বিপ্লবী সুরজ সিং সেই রাত্রে পালিয়ে যায় 'শ্রীমতী কাফে' থেকে। এবারও পুলিশ সুরজ সিংকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় 'শ্রীমতী কাফে' থেকে। ভজু তার দোকান বার বার পুলিশের তল্লাশিকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা বিপ্লবীদের আশ্রয় দেয়। বিপ্লবী সুরজ সিং 'শ্রীমতী কাফে'তে খাওয়া ও থাকা বাবদ ভজুকে টাকা দিতে চায়। ভজু টাকা নিতে অস্বীকার করে। ভজু তাকে বলে — "সাহেব মারা দলের কাছ থেকে 'শ্রীমতী কাফে' পয়সা নেয়না।" সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি স্মরণযোগ্য — "বাসন্তী কেবিনের মালিক হরিহরবাবু প্রায়ই একটা কথা বলতেন, — "দেশকে ভালোবাসার যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু দেশকে যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসতে আমার ভালো লাগে।' "[২৮] সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি ভজুর গভীর ভালোবাসা। সে মজুর বাঙালির সঙ্গে মদ খায়। ঘোড়ার গাড়ীর চালক ভুনু তার বন্ধু। অথচ সে শিক্ষিত, শিক্ষার প্রতি তার সম্ভ্রম আছে। আবার সত্যকে প্রকাশ করতে সে দ্বিধা করেনা। 'শ্রীমতী কাফে'তে ভজুর সঙ্গে সমাজের যে ভদ্রশ্রেণির লোকেরা মদ খায়, তা সে সকলের কাছে প্রকাশ করে দেয়। সে দুর্বিনীত, দুর্মুখ তাই সে বন্ধুহীন। জীবনের প্রতি তার যত অবহেলাই থাক তার মনের গভীরে শৌখিন মানুষরা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সে 'শ্রীমতী কাফে'র নাম যুঁই কেবিন করার কথা ভেবেছিল। ঔপন্যাসিক ভজু ঘোড়ার গাড়ীর চালক ভুনু চরিত্রের মধ্যদিয়ে সমাজের শোষিত নিপীড়িতদের প্রতিবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। সমরেশ বসুর নিপীড়িত শোষিত মানুষের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

গান্ধীবাদী হীরেন 'শ্রীমতী কাফে'তে সুরজ সিংকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি সমর্থন করেনি। দোকানে পুলিশির তল্লাশির জন্য ভজু বিমর্ষ। খদ্দেরের ভাঁটা পড়বে। আবার সে উদ্বিগ্ন সুরজ সিংএর নিরাপত্তা

নিয়ে। কখনো সে ভাবে দোকানটা উঠিয়ে দেওয়ার কথা। শুধু খদ্দের নিয়ে তো ভজুর জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই সে বলে — "আর যারা তার জীবনে রয়েছে, তারা না ছাড়লে সে কী করে ছাড়বে তাদের। এ সবে তার বিশ্বাস নেই সত্য, কিন্তু এরা ছাড়া এ দেশের আর আছে কারা ? তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় 'শ্রীমতী কাফে'তে সে টাঙিয়েছে তার দাদার দেবতা চক্রধারী নারায়ণের ছবি। সেই নারায়ণের শিষ্যদের সে কোথা যেতে বলবে।"

গান্ধীবাদী হীরেন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বিদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। গান্ধীর প্রতি তার গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। অহিংসার পথে সে বিশ্বাসী। সে কৃপালকে বলে — এ দেশকে তারা বোঝেনি তাই বিদেশীদের আন্দোলনের অনুকরণ করতে চাইছে। গান্ধীজীর আদর্শকে তারা কেউ বোঝেনি। "আমরা নিজেরাই তার জন্য দায়ী, আমরা আমাদের মতামতকে বজায় রাখতে পারিনি কৃপান। ভেবো দেখো, দুহাজার গজ সুতো না কেটেও আমাদের অনেক মহারথী কমিটির সভ্য হওয়ার সুযোগ নিয়েছে।" অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ মোচনের জন্য সে ধাঙর মেথর বস্তিতে যায়। ভালোবাসে ঝাড়ুদার রামাকে। বিশ-বাইশ বছর বয়সের রামার আদি বাস ছিল বিহারে। একদা স্বামীর সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল ইটখোলায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর সে বেকার হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। রামাকে দেখে হীরেনের মনে হয়েছে গান্ধীজীর সেই নিরন্ন, অশিক্ষিত কুসংস্কারাছন্ন ভারতবাসী এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বিধবা নিরাশ্রয় রামাকে হীরেন আদর্শের পথ দেখিয়েছে। মিউনিসিপালিটিতে সংগ্রহ করে দিয়েছে ঝাড়ুদারনীর কাজ। শুনিয়েছে রামাকে গান্ধীজীর বাণী, শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতা, বুঝিয়েছে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, নির্দেশ দিয়েছে তকলিতে সুতো কাটার। রামাও হীরেনের আদর্শে বিশ্বাসী। সে নিজে হাতে চড়কায় সুতো কেটে 'শ্রীমতী কাফেতে এসে তুলে দেয় হীরেনের হাতে। হীরেন বিশ্বাস করে অশিক্ষিত নিরন্ন দেশবাসীর মধ্য থেকে বেড়িয়ে আসবে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক নেতা। তাই সে রামার আমন্ত্রনে নির্দ্বিধায় চলে যায় ঝাড়ুদার বস্তিতে। বস্তিতে সে সকলের সঙ্গে অন্ন ভাগ করে খায়। বস্তিবাসী তারির নেশায় মত্ত হয়ে মিউনিসিপালিটির কমিশনারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার কাছে। নেশায় উন্মত্ত বস্তিবাসী কোলাহলমুখর হয়ে উঠে। রামাও নেশা করে বস্তির সকলের শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলছিল। হীরেনের মনে হয় এ যেন সেই রামা নয়। বস্তির সকলে কম বেশি বেসামাল। অপ্রকৃতিস্থ বস্তিবাসী হীরেনকে মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ঢেলে দেয় হীরেনের গায়ে

মদ। হতাশ ও নিরাশ হয়ে বিপর্যস্ত হীরেন পালিয়ে আসে 'শ্রীমতী কাফে'তে। ভজুর কাছ থেকে সে মদ চেয়ে খায়। অথচ হীরেন রামার মধ্যে গান্ধীজীর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে পেয়েছিল। রামাকে সে অনুপ্রাণিত করে বলত — "তোমার উপর আমার কত ভরসা। আমার নয়, সারা বস্তির, তোমার আপনার, তোমার পর, সকলের, তোমার দেশের। সে ভরসা তুমি ভেঙে দিত চাও ?" তুমি ঝাড়ুদার বস্তিতে থাকতে পারো। কিন্তু তোমার পথ ভিন্ন। তুমি গঙ্গা, নোংরা খাল সংকীর্ণ নালাকে তুমি তোমার পথে টেনে এনো না। তোমাকে সমুদ্রে যেতে হবে কিন্তু তুমি গঙ্গা হয়েও খালের সংকীর্ণ পথ ধরেছে। এই পথ তোমার নয়, তুমি ওদের প্রকৃত পথ দেখাবে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "শ্রেণীসীমা ভেঙে হরিজন বস্তিতে হীরেনের ছুটে যাবার সংকল্প যেমন ব্যর্থ হয়, ঠিক তেমনই ব্যর্থ হয় হীরেনকে ঘিরে ঝাড়ুদার বস্তির রামার স্বপ্ন। সেখানে কঠিন বাস্তবের আঘাতে যখন হীরেনের সংকল্প ও সাধনা চূর্ণ হয়ে যায়, তখনই ধ্বনিত হয়েছে রামার অসহায় হাহাকার, 'বাবুজী, হমকে লে চলিয়ে আপকো সাথ। হম এঁহা নহি রহেগা নহি।" [২৯] বস্তির যুবক রামাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়েছিল হীরেনের কাছে। হীরেনকে জোর করে উন্মত্ত বস্তিবাসী মদ খাওয়াতে চাইলে রামা ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাধা দেয়। হীরেন অপমানে বেদনায় পালিয়ে আসে। রামা হীরেনের পেছনে ছুটে আসে উর্দ্ধশ্বাসে। নির্ভয়ে অসঙ্কোচে হীরেনকে তার মতো জড়িয়ে ধরে রামা। হীরেনের বস্তিতে ব্যর্থ হয়ে আসা প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত — "হীরেনের স্বপ্নভঙ্গ আমাদের মধ্যবিত্ত রাজনীতির ইতিহাসে প্রতীকী — হীরেনের স্বপ্ন ছিল, আদর্শ ছিল, কিন্তু যে ভারত-আত্মার কথা সে ভাবত, তার বাস্তব সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা-জ্ঞান ছিল না। এই বাস্তবের সামনে হীরেনরা আমাদের দেশে বারবার শিকড়হীন স্বপ্নের ভেঙ্গে যাওয়া যন্ত্রণায় ডুবে গেছে।"[৩০] রামা শেষ পর্যন্ত ঐ ছোকরার সঙ্গে থেকেছে, তাদের একাধিক সন্তান হয়েছে। পরিণত হয়েছে সে অপরিচ্ছন্ন বস্তিবাসিনীতে।

বাঙালি মদ পান করে 'শ্রীমতী কাফে'তে বিপ্লবীদের কাছে দেশের কথা শুনতে চাইলে হীরেন রেগে ওঠে — "দেখো বাঙালি, দেশের কথা যদি শুনতে হয়, তবে তোমাকে পবিত্র হতে হবে। স্বরাজ তোমার আমার হাতে।" বাঙালি সাধারণ রেল ইয়ার্ডের খেটে খাওয়া মজুর। নেশায় মত্ত হয়ে সে গান বাঁধে। স্বাধীনতা-বিপ্লব এসবের অর্থ সে বোঝে না। সে প্রতারিত ও শোষিত। বাঙালি ইংরেজ সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হীরেনের কাছে। সাহেবের কাছে ন্যায্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক চাইলে সাহেব তাদের মজুরি

কেটে নেয়। বাঙালির অভিযোগ শুনে হীরেন ও প্রিয়নাথ চাটুজ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হীরেন ও প্রিয়নাথ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও উভয়ে বিশ্বাস করে অশিক্ষিত নিরন্ন দেশবাসীর মধ্য থেকে ভবিষ্যতে বেরিয়ে আসবে নেতা। বাঙালি অভাবের যন্ত্রণায় কাতর। সে হীরেনের উচ্চ আদর্শের কথা, মিটিং স্বরাজ এসবের অর্থ বোঝেনা। মদের নেশায় জড়ানো গলায় বলে — "তোমরা সেদিন মিটিনে বললে, দেশের লোককে লেখাপড়া শেখাবে, জাতবেজাতের ছোঁয়াছুঁয়ি উঠিয়ে দেবে। কে তোমার কলকাতা থেকে এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও বলেছেন।" সমালোচক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন — "বাঙালীর মত শত শত শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, নেশাখোর মানুষেরা যেন অসংখ্য নিশাচর প্রেতের মতো ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। তারা স্বাধীনতার মর্ম বোঝে না, জীবনকে চেনে না, সংযত আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝে না। তবু এই গরলকে পান করে এই স্তূপীকৃত জঞ্জালকে নিজেদেরই সরিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে — গান্ধীজীর এই হল আন্তরিক অভিপ্রায় এবং সেই সংকল্পে নিবেদিতপ্রাণ হীরেন নিয়োগী।"[৩১]

'শ্রীমতী কাফে'তে পূর্বের মতো সান্ধ্য আড্ডা জমজমাট। তবে খদ্দেরের থেকে রাজনৈতিক বিপ্লবীদের সংখ্যা বেশি। মতভেদ ঘটেছে বিপ্লবীদের মধ্যে। হীরেনের মদের দোকানে পিকেটিংকে শুধু পুলিশ নয়, শ্রমিকরাও সমর্থন করেনি। হীরেন, কৃপাল মিউনিসিপালিটির নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করে। 'শ্রীমতী কাফে' যেন ক্রমশ কংগ্রেস অফিস হয়ে উঠে। নারায়ণের অনুপস্থিতিতে প্রিয়নাথ পার্টির দায়িত্ব নিয়েছে। রথীন, সুনির্মল, প্রিয়নাথ সকলে আসে 'শ্রীমতী কাফে'তে। আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট আবার তল্লাশি করে 'শ্রীমতী কাফে'তে। ভজু বিপ্লবীদের কাছ থেকে চায়ের দাম নেয়না। 'শ্রীমতী কাফে'তে সে আশ্রয় দেয় গুলিবিদ্ধ সুনির্মলকে। রিভলবার ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তার হাতে গুলি লাগে। রথীন পুলিশের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে নিয়ে আসে ভজুর দোকানে। সাময়িকভাবে ভজু ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সে সুনির্মলের চিকিৎসার জন্য তার শেষ সম্বল অর্থটুকুও দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় সে সুনির্মলের জন্য উদ্বিগ্ন। প্রিয়কে ভজু জিজ্ঞাসা করে সে বাঁচবে তো। অথচ অর্থের অভাবে ভজুর সংসার ক্রমশ অচল হয়ে পড়ে। ঋণগ্রস্ত হয় সে। যুঁই এর বাবা অর্থাৎ ভজুর শ্বশুর তার বাবাকে অভিযোগ করে চিঠি দেয় কন্যার প্রতি অবহেলা ও অযত্নের। শ্বশুরের চিঠিতে সে অপমান বোধ করে। সে মদ্যপ অবস্থায় গাড়োয়ান ভুনুর গাড়িতে চেপে রাতে ছুটে যায় প্রতিবাদ জানাতে। সদ্য সন্তানের জননী যুঁইকে সে বলে

— "আমাদের বাড়িতে তোমার যত্ন তোমাকে নিতে হবে। অন্যথায় তোমার আদরের জায়গা তুমি খুঁজে নিতে পারো — সে স্বাধীনতা তোমার আছে।" স্বামীর প্রতি কোন অভাব-অভিযোগ নেই তার স্ত্রীর। সে নীরবে সব মেনে নেয়। যুঁইএর মার প্রত্যাশা ছিল মাতৃহীন শিক্ষিত ভজুকে স্নেহের আঁচলে বেঁধে রাখবে। 'শ্রীমতী কাফে' ছাড়া ভজুকে আর কোন বন্ধনই বাঁধতে পারেনি। এমনকি স্ত্রী যুঁইও পারেনি। সংসারের চরম আর্থিক অভাব অনটনেও বার বার 'শ্রীমতী কাফে'তে পুলিশের তল্লাশিতে সে হতাশ হয়ে পড়ে। দুঃসময়ে মনে পড়ে দাদার কথা — "সেই নির্ভীক শান্ত মুখ। কেন এত নির্ভয়, কীসের এত নির্ভয়। আমিতো পারিনে এত শান্ত থাকতে। আমার গৌর, নিতাই, যুঁই, আমার এই অন্তঃসারশূন্য শ্রীমতী কাফে, আমার বাবা, আমার দেনা, আমার ভয়, বেদনা, সুখ, দুঃখ, এ সব ছাড়া যে আমার নিষ্কৃতি নেই।" অভাবে জর্জরিত হয়ে সে হা হা করে হাসে, নেশা করে, তবু সে কখনওই বাস্তবকে ভুলে থাকতে পারে না। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলে — এ যুগ ক্রুদ্ধ, বীভৎস, বিশ্বাসঘাতক। কত দিন সে জোর করে বেঁচে থাকবে। হয়ত তাকে হার মানতে হবে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হতে হবে এ যুগের কাছে। বাঙালি ভজুর দোকানের নিয়মিত খদ্দের। সে প্রতিবাদী। তিলক ঠাকুরের অন্যায়কে সে মেনে নিতে পানে না। নবার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে তিলক ঠাকুর কাজ দেবে বলে নিজে কদিন স্ফুর্তি করে তাকে পতিতা পল্লিতে দেহব্যাবসার কাজে নিয়োগ করেছে। বাঙালি আজ অনুতপ্ত ও আত্মযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত। বাঙালি তাকে তারকেশ্বর থেকে পছন্দ করে এনে নবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। নবার বিধবা স্ত্রী দেহব্যাবসার কাজে নিয়োজিত হলে প্রথমে বাঙালি তার উপর রাগ করেছিল। আজ সে পতিতাপল্লিতে গিয়ে জানতে পেরেছে — তিলক ঠাকুরের চক্রান্ত তাকে এই পথে নামতে বাধ্য করেছে। বাঙালি জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে ভজুকে বলেছে — "ঠাকুর, ভাবি কোনও দিন লবার কপাল আমার হবে।" ভজু জীবনের প্রতি হতাশ ও নিরাশ হয়ে বলেছে — বাঙালি হয়তো একদিন বাঁচার জন্য ছুটে যাবে দেশে দেশে, আজ মারেনি, হয়ত আগামী কাল সে কালা ধলা সাহেবেকে গলা টিপে হত্যা করে জেলে যাবে, ফাঁসির দড়ি গলায় পড়বে। "আর আমি ? আমি শুধু পড়ে থাকব।" ভজু আবৃত্তি করে —

"এ মহানিদ্রা ঘুচিবে জানি,
আকাশে ধ্বনিবে অভয়বাণী।"

গুলিবিদ্ধ সুনির্মলের বাবা ছেলের খোঁজে ভজুর 'শ্রীমতী'তে এলে সুনির্মলের বাবাকে সে মিথ্যা কথা বলে। সুনির্মলের বাবা ভজুর দাদা নারায়ণকে অভিযোগ করে বলে, নারায়ণ তার ছেলের মাথা খেয়েছে। ভজুকে সুনির্মলের দলের লোক বলে। ভজু তা নীরবে মেনে নেয়। ভজু শুধু সুনির্মলকে 'শ্রীমতী কাফে'তে আশ্রয় দেয়নি। অসুস্থ সুনির্মলকে ভজুর কর্মচারি চরণ ডিমের অমলেট মাখন খেতে দিলে, ভজু অনুযোগের সুরে চরণকে নির্দেশ দেয় সঙ্গে একটু গরম দুধ দিতে। বাহ্যিক রাগ করলেও আসলে ভজু চরণকে নির্দেশ দিয়েছে। নারায়ণ প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 'শ্রীমতী কাফে'তে ওঠে । পাঁচ বছর বাদে সে ফিরেছে। হীরেন, কৃপাল, প্রিয়সহ সকলে তার সঙ্গে 'শ্রীমতী কাফে'তে দেখা করতে এসেছে। ভজু তখন মদের নেশায় বিভোর। নারায়ণের আগমনে 'শ্রীমতী কাফে'তে বহু লোকের সমাগম হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ হয়েছে নারায়ণ জেল থেকে ফিরে 'শ্রীমতীতে' জনসভা করছে। পুলিশ তাকে সাবধান করে দিয়ে যায়। তার সভা সমিতি করা নিষেধ। বিপ্লবী নারায়ণকে সকলে প্রণাম করে। গাড়োয়ান ভুনু নারায়ণকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। দূর থেকে সেও হাত তুলে প্রণাম করে। বিপ্লবী রথীন, সুনির্মলও নারায়ণকে প্রণাম করে। পুলিশ নারায়ণকে সভা-সমিতি না করার নির্দেশ দিয়ে ভজু আবেগপ্রবণ হয়ে পুলিশকে বলে — "মশাইয়ের এটা সভাস্থল বলে মনে হল। বেশ সভাস্থলই হয়ে উঠুক তবে এটা। চা-পানের সভা। উঠে এসো সব, চলে এসো ভেতরে। চলে এসো।" নারায়ণ জেল থেকে ফিরে কিছুদিন বাড়িতে থাকে। সে ভাই ভজুর অত্যধিক মদ পান নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভজুকে সে সংসারের হাল ধরার জন্য অনুপ্রাণিত করে। নারায়ণ নিজেও অনুতপ্ত সংসারের জন্য কিছু না করতে পারার জন্য। নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে আসে নকুলেশ্বরের মেয়ে প্রমীলা। একদা শৈশবে প্রমীলা তার ঠাকুমাকে বলেছিল সে নারায়ণকে বিয়ে করতে চায়। প্রমীলাকে দেখে বিপ্লবী নারায়ণের মন এলোমেলো হয়ে যায়। প্রমীলা তার ছেলে নবীনকে বিপ্লবী নারায়ণের আদর্শে দীক্ষিত করতে চায়। নবীনও নারায়ণকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। সেও অনুপ্রাণিত নারায়ণের আদর্শে। সমালোচক নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত — "সংসার নিরাসক্ত বিপ্লবী বলে সমরেশ নারায়ণকে সূক্ষ্ম সুকুমার মানবীয় গুণ থেকে বঞ্চিত করেননি। সংগ্রামের উষর ক্ষেত্রেও একদিন তাঁর জীবনে প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে। কিন্তু দাম্পত্যের বন্ধনে ধরা পড়ার আগেই তাঁকে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে হয়।"[৩২] প্রমীলা নারায়ণকে না পেলেও নিজের সন্তান নবীনকে বিপ্লবী নারায়ণের আদর্শে উৎসর্গ করতে চায়।

প্রিয় সম্প্রতি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। সে শ্রমিক মজুর কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করতে চায়। সে রথীন ও সুনির্মলের সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করে না। হীরেন কৃপালের সঙ্গে নারায়ণের মতাদর্শে নিয়ে মত পার্থক্য হয়। নারায়ণ শ্রমিকদের বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। চটকলের শ্রমিকরাও নারায়ণের আদর্শে বিশ্বাসী। শ্রমিক মনোহর ও ভাগন সদ্য জেল থেকে ফিরেছে, 'শ্রীমতী কাফে'তে দেখা করতে এসেছে নারায়ণের সঙ্গে। ভজু ওদের অভ্যর্থনা করে 'শ্রীমতী'র ভিতরে, বসতে দেয় কুরশিতে। ভজু কৃপালকে বলে — "আমার কাছে স্বদেশীওয়ালার কোন জাত নেই। ভুনু গাড়োয়ান আমার সারথী, বাঙালি আমার বন্ধু। আর এ জেল খাটা স্বদেশীদের আমি মাটিতে বসতে দেব। ভজু ওদেরকে 'শ্রীমতী কাফে'র অতিথি বলে সম্বোধন করে। মনোহর ভাগন স্বরাজ চায়, আন্দোলন করার জন্য ইংরেজ কোম্পানি এদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ করতে চায়। নারায়ণ এদের অভিযোগ শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার অন্তরে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। বিলিতি কোম্পানি এদেশের মানুষকে জানোয়ার ভাবে। এদের হাত থেকে মেয়ে ও শিশুরা নিষ্কৃতি পায় না। কংগ্রেসী শংকর নারায়ণ শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনকে সমর্থন করে না। সে মদ্যপ বাঙালিকে বিদ্রুপ করে বলে — দিগ্বিজয় করে ফিরছে আর এক মজুর। সে নারায়ণকে বলে তোমরা রাজনীতি, বিপ্লব করবে এই মাতালদের নিয়ে। এরা স্বরাজের-সংগ্রামের জঞ্জাল। নারায়ণের আদর্শ ভিন্ন, সে মানুষকে ভালোবাসে। সে বলে — "আমি এদের ভালোবসি। যারা চিরদিন পড়ে পড়ে মার খায়, তারা একদিন না মেরে ছাড়বে না। যতই মদ খাক — এরা একদিন শোধ নেবেই। সেটাই হবে বিপ্লব। পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর 'শ্রীমতী কাফে'তে। ভজু পুলিশকে ভ্রূক্ষেপ করে না। দেশের ডাকে নারায়ণ গভীর রাতে নিঃশব্দে গৃহ ছাড়ে। ভজুর বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি করে। সেখানে পায় শুধু বিদ্রোহী কবি নজরুলের একটি বই। বাড়ির প্রত্যেককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। 'শ্রীমতী কাফে'তেও পুলিশ আবার তল্লাশি করে। স্বয়ং এস. ডি. ও. নির্দেশ দেয় পুলিশ অফিসারকে 'শ্রীমতী কাফে'টি বন্ধ করে দিতে। পুলিশ তল্লাশির স্বার্থে বন্ধ করে না 'শ্রীমতী কাফে'। এবারও পুলিশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তিন মাসের মধ্যে একাধিকবার পুলিশ 'শ্রীমতী কাফে'তে তল্লাশি করেছে। খদ্দেরের সংখ্যাও কমে গেছে। 'শ্রীমতী কাফে' যেন একটি নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়েছে, বিক্রিও নেই। শুরু হয় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন। স্কুল, কলেজ, সরকারী চাকরি। লবন আইন ভাঙা, বিলিতি কাপড় ও মদ ছাড়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। শ্লোগান দেয় স্বায়ত্ব শাসন আমাদের জন্মগত

অধিকার। প্রিয়বাবু বাড়িতে অন্তরিন হয়। রথীন, সুনির্মল, শঙ্কর ঘোষ, কৃপাল গ্রেপ্তার বরণ করে। 'শ্রীমতী কাফে' নিষিদ্ধ এলাকা থেকে আবার প্রসিদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। 'শ্রীমতী কাফে' স্বদেশী রেস্টুরেন্ট নামে পরিচিত হয়। ভজুর নিত্য মদ্যপানের সঙ্গী বাঙালি ও ভুনু। "তারা যেন একটা মস্ত রঙ্গমঞ্চের অদ্ভুত নাটকের তিনজন দর্শক।" বাঙালি বিপ্লবী না হয়েও তার মধ্যে বিপ্লবের জোয়ার আসে। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তার মধ্যেও অস্থিরতা দেখা যায়। চোখ দুটো তার জ্বলতে থাকে, হাতের মুঠি পাকিয়ে সে ভাবে কিছু একটা করা দরকার। নিত্য পুলিশের অত্যাচারের কাহিনি শুনে সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সে জানে না কী ভাবে সে প্রতিবাদ করবে। গাড়োয়ান ভুনুও পরাধীনতার গ্লানিতে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। শহরের একশো চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য করে হীরেন মিছিল করে ডায়মণ্ডহারবার যাত্রা করে। পায়ে হেঁটে তারা যাবে কলকাতা পেড়িয়ে দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে। উদ্দেশ্য লবণ তৈরি করবে। রথীন সুনির্মল নতুন করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করে। ডাক দেয় ছাত্র ধর্মঘটের। বিলিতি কাপড় ও সিগারেটের দোকানে পিকেটিং করে। বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব চলে রাস্তার উপরে। বিপ্লবীরা দোকানদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কাপড়, বিদেশী দ্রব্য, আবার কেউ স্বেচ্ছায় দেয় শাড়ি, সায়া, ব্লাউস। কেউ কেউ রাস্তার শুকনো রাবিশও ছুঁড়ে দেয় আগুনে। যেন তারা আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে। ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে দেহোপজীবিনীরাও যোগ দিয়েছে আন্দোলনে। শ্লোগান দেয় বন্দেমাতরম।

অপরদিক থেকে হীরেনের ধীর ও শান্ত মিছিল আসে। হীরেনের দলে রয়েছে সন্তোষ মাসিমা, হীরেনের বিধবা ভ্রাতৃবধূ। সে শ্বশুরবাড়ির অনুশাসন ভেঙে দেওর হীরেনের সঙ্গে আন্দোলনে নেমেছে। ভাঙতে চলেছে বিদেশি সরকারের অনুশাসন। ঘরের আইনকে ভেঙে, রাস্তায় এসে অমান্য করেছে আর এক আইন। এছাড়া রয়েছে আরো কয়েকজন মহিলা সদস্য। ঝাড়ুদারনী রামা এখন 'শ্রীমতী কাফে'তে আসে না। সে শুধু দূর থেকে দেখছিল বাবুজির দলের আন্দোলনকে। সুনির্মল, রথীনদের মিছিলের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এদিকে লুণ্ঠনকারীরা গলিতে ওৎ পেতে বসে থাকে। ছাত্ররা জোর করে মনিহারির দোকান থেকে বিলিতি মাল সিগারেট ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দেয়। দোকানদাররা হাত জোড় করে মিনতি করে তাদের জিনিস নষ্ট না করার। ভজু প্রতিবাদ করে স্বদেশী ছাত্রদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ভজু তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ করে বলে কে কিনতে বলেছে বিলিতি মাল। নষ্ট করতে হলে পয়সা দিয়ে কিনে কর। ভজু স্বদেশীর নামে

ভণ্ডামিকে সমর্থন করেনি। সে অন্যের বিলিতি মাল স্বদেশীদের জোর করে জ্বালিয়ে দেওয়াকে সমর্থন করেনি। উত্তর দিক থেকে পুলিশের সামনে এগিয়ে আসে হীরেনের দল। তাদের পণ যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে তারা আন্দোলন করবে। এগিয়ে যাবে পুলিশের সামনে। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, বিরোধ, লড়াই। অপরদিক থেকে রথীন সুনির্মলদের দলও আক্রমণ করে পুলিশকে। গোরা পুলিশও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর। শুরু হয় খণ্ড যুদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য আন্দোলনকারীরা প্রবেশ করে 'শ্রীমতী কাফে'তে। পুলিশও 'শ্রীমতী কাফে'তে প্রবেশ ক'রে আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি চার্জ করে। ভেঙে দেয় 'শ্রীমতী কাফে'র কাঁচের দরজা। ওলোটপালট করে দেয় সব জিনিস পত্র। দেওয়ালের মহামানবের ছবি গুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। যে চেয়ারে ভজু একদিন তাকে বসার অনুমতি দেয়নি, সেই চেয়ার ছুঁড়ে ফেলে দেয় প্রোপাইটার। ভেঙে তছনছ করে দেয় কাপ ডিস। জলে থই হই করে রান্না ঘর। পুলিশ গ্রেপ্তার করে সকলকে। বাইরে থেকে ঢিল পাটকেল ছোঁড়ে পুলিশের গায়ে। আহত হীরেন চিৎকার করে বলে, কেউ ঢিল মেরো না, আঘাত করো না, এ পথ আমাদের নয়। হীরেন গান্ধীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী। স্কুলের সরসী দিদিমণি অচৈতন্য সুনির্মলকে ভুনুর গাড়িতে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। দিদিমণি তাকে সেবা যত্ন ক'রে সুস্থ ক'রে তোলে।

ভজু শ্রীমতীর ভগ্ন দশা দেখে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। রাগে ক্ষোভে আগুনের মতো লাল হয়ে যায় তার মুখ। সে শ্রীমতীতে প্রবেশ করে, বীভৎস দৃশ্য দেখে তার মনে হয় — সে যেন বহুদিনের পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সারা ঘর কাপ ডিস ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে। রান্না ঘরের বেড়ায় হেলান দিয়ে শ্রীমতীর বাবুর্চি চরণ কাদায় বসে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। সেও পুলিশের মার খেয়েছে। উনুন জ্বলেছে, কেতলির ঢাকনাটা ফুটন্ত জলের ধাক্কায় ঠক ঠক করে নরছে। চরণ হাঁটু ও কাঁধে চোট পেয়েছে। ভজুকে দেখে সে কেঁদে ফেলে। ভজু তাকে তুলে নিয়ে এসে বসায় বেঞ্চিতে। দোকানের ভগ্ন দশা দেখে মদ্যপান ক'রে ভজু একা টেবিলে মাথা এলিয়ে বসে থাকে। ঠিক এই সময় প্রবেশ করে নারায়ণ। কাঁধে সেই ঘরছাড়া ব্যাগ। নারায়ণ ভজু মাথায় হাত রেখে বলে — "ভজু, ভজন, আমার পেছনে পুলিশ রয়েছে ভাই। এখনও গঙ্গার ওপার। আমাকে এখুনি হাড়মুণ্ডি পুলের ধারে পৌঁছে দিতে হবে।" ভজু নেশায় আচ্ছন্ন, সে দাদা নারায়ণকে প্রথমে চিনতে পারেনি। নারায়ণ হতাশ হয়ে দৃঢ় গলায় বলে — "ভজু যেমন করে হোক পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা একটা তোকে করতে হবে। তোর প্রাণের ভার আমার। ভজু দাদাকে ভালোবাসে। দাদার জন্য সে

নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে নিজের প্রাণের ভার কাউকে দেয় না। দাদাকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে সে ছুটে যায় ভুনুগাড়োয়ানের কাছে। নারায়ণ তাকিয়ে দেখে 'শ্রীমতী কাফে'র ভগ্ন অবস্থা। ভজু মদ্যপ ভুনুকে আস্তাবল থেকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ডেকে আনে। চিৎকার শুনে ভুনু ভেবেছিল মদ্যপ ভজু নেশার ঝোঁকে ভুল পথে এসেছে। হাড়মুণ্ডির কথা শুনে ভুনু অবাক হয়ে বলে — "এ ঝড় বরসাত মে হাড়মুণ্ডি পুল কেয়া তুহমহারা দিমাক বিলকুল খারাপ হো গয়া।" ভুনু নারায়ণের বিপদের কথা শুনে আপত্তি করেনি। সে নারায়ণকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। স্ত্রী মণিয়ার বাধা ও নিষেধ উপেক্ষা করে ভুনু দুরন্ত ঝড়, মেঘের গর্জন ও তীব্র বিদ্যুৎ ঝলক ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে অতিক্রম করে নারায়ণকে পৌঁছে দেয়। ঔপন্যাসিক ভুনু চরিত্রের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ বিপ্লবীর চিত্র উপস্থাপন করেছেন। গাড়োয়ান ভুনু সক্রিয় বিপ্লবী না হয়েও বিপ্লবীদের সমর্থন করে। নিজের জীবন বাজি রেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তৃষ্ণার্ত ভুনু এক ভাঁর মদ চাইলে নারায়ণ সোনা দিতে চেয়েছিল। ভুনু বিপ্লবী নারায়ণকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তার কাছে অর্থ, সোনার মূল্য অতি সামান্য। তাই সে বলে — "লারাইন ঠাকুর, তুমার কাছে তাড়ি মেঙ্গেছি পিয়াসের জন্যে। না পারেন কথা নেই। মগর রুপেয়া আর সোনা। সেতো বহুত ছোট। আজ জান দেনে আয়া রহা। এ আঁখসে তুমাকে তো দেখে লিয়িছেন। আর কুছু চায় না ভুনু।" ভজু বিপ্লবী না হয়েও নিজের জীবন বিপন্ন করে পৌঁছে দিয়েছে নারায়ণকে হাড়মুণ্ডিতে। সমালোচক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রসঙ্গে বলেছেন — "কিছু করতে না পারলেও সে ব্রিটিশ শাসকের শ্যেন দৃষ্টির আড়ালে রাখতে চেয়েছে সুরয, সুনির্মল, রথীন, প্রিয়নাথ, মনোহর, ভাগনদের। নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝড়-জল-দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে ভুনু গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তার দাদা নারায়ণকে পুলিশী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হাড়মুণ্ডি পুলের ওপরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এর থেকে একদিকে যেমন সংগ্রামী জীবনের প্রতি তার আত্যন্তিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অনুরাগভরা আস্থা ফুটে উঠেছে এইসব অর্ধভুক্ত নেশাখোর ভুনু গাড়োয়ানদের মানবিক মহত্বের প্রতি।"[৩৩] তাই ভুনুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় ভজু বলে — 'জীবনের ভাঙা পথে আমি যেন তোর মত গাড়োয়ান হতে পারি। আমি যেন মুঠে হতে পারি। আমাকে যেন কোন দিন থামতে না হয়, কোন দিন না।'

'শ্রীমতী কাফে'তে ক্রমশ নিয়মিত খদ্দেরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচিত্র খদ্দের, বিচিত্র তাদের গল্প। তবুও ভজুর অবসাদ কমে না। যেমন ভজুর বেড়েছে মাতলামি, তেমনি পাগলামি। ভজু কবি। সে

গান গায়, কবিতা বলে। বাঙালি জীবনের প্রতি হতাশ ও নিরাশ হয়ে বলে — "এ জীবনটা আর ধরে রাখতে প্রাণ চায়না গো ঠাকুর। ভাবি, শালা জন্মালুমই বা কেন, কেন বা রইচি বেঁচে।" ভজুও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ — তারও একই প্রশ্ন। মহাদেব হালদার ভজুকে পুলিশের আক্রমণে দোকানের ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। আশ্বাসও দিয়েছিলসে সব ব্যবস্থা করে দেবে। ভজু সচেতন, তাই সে বলে "কার কাছে মামলা? ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে, ইংরেজ সরকারেই কোর্টে? ও সব ধোঁকাবাজিতে সে যেতে চায় না। শান্ত যুঁই ভজুকে ভালোবাসে। কিন্ত প্রেমের বাঁধনে স্বামীকে বাঁধতে পারেনি। স্বামীর অত্যধিক মদ্যপান নিয়ে দুঃচিন্তা করে সে। রামা আবার ভজুর দোকানে আসে। ভজুকে বলে — "লাট বাবুজি! নমস্তে।" নমস্কার জানাতে সে ভোলেনি। তার বেশভূষা আগের থেকে নোংরা হয়েছে। মাথার চুলে জট ধরেছে একটু করে। রোগা হয়েছে। সে একাধিক সন্তানের জননী। কোলে কয়েক মাসের একটি বাচ্চা। বিয়ে না করেও একটি ছেলের সঙ্গে ঘর করে। এর জন্য পঞ্চায়েতকে বিশ টাকা বখশিস দিতে হয়েছে। সরসী দিদি, মণি এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় 'শ্রীমতী কাফে'র দিকে তাকিয়ে দেখে। হীরেনের বউদি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার সে অন্দরবাহিয়েছে। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করে ঘোড়ার গাড়িতে কোথাও যাওয়ার সময় 'শ্রীমতী কাফেঁর দিকে তাকায়। ভজুর মদের নেশা ক্রমশ বেড়েছে। নেশায় সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ঝিমোয়। দোকানের ঘড়ির টং টং শব্দকে তার মনে হয় এ ঘণ্টা নয়, যেন কোনও রহস্যময়ীর চটুল হাসি। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে আবোল-তাবোল ভাবে। কখনো স্ত্রী যুঁইকে, কখনো নারায়ণকে, আবার কখনো প্রিয়, বাঙালি, হীরেণ ও রামাকে। জেল থেকে বিপ্লবীরা সকলে ফিরে এসেছে। আবার আড্ডা জমেছে 'শ্রীমতী কাফে'তে। শুধু নারায়ণ আসেনি। বিপ্লব করার অপরাধে ইংরেজ সরকার তাকে আন্দামান সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে বন্দী রেখেছে। সেখানে মাতৃভূমির কোন সংবাদ পৌছায় না। মাঝে মাঝে সে ভজুকে চিঠি লেখে। তার চিঠির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে প্রমীলা, ছুটে আসে 'শ্রীমতী কাফে'তে চিঠিগুলো দেখতে। প্রিয়নাথের উপর থেকে সরকার পরোয়ানা তুলে নিয়েছে। সে এখন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক। পঞ্চাশ বছর আগে অ্যালান হিউম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'কংগ্রেস' যেমন বিদেশি ও দুর্বোধ্য ছিল, আজকের কমিউনিস্ট পার্টিও তেমনই বিদেশিও দুর্বোধ্য। প্রিয়নাথ যে পথ নিয়ে একদিন নারায়ণের বিশ্বাস হারিয়েছিল, সেই পথেই সে তার সিদ্ধির অন্বেষণে ছুটে চলেছে। মজুর বস্তি তার এখন কর্মক্ষেত্র। যে রথীন তার বিরোধিতা করেছিল সে এখন প্রিয়নাথের নিত্য সঙ্গী। পথ বিচ্যুত হয়েছে

সুনির্মল। পার্টি থেকে সে অনেক দূরে। কৃপাল বিলিতি মদ ও সিগারেট খায়। অবসাদে ভেঙে পড়েছে হীরেন। রাজনীতি থেকে সে অনেক দূরে সরে গেছে। সূতো কাটে ও ধর্মগ্রন্থ পড়ে সময় কাটায়। হীরেনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। জেল থেকে ফিরে সে রামাকে চিনতে পারেনি। হীরেন বউদির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাতেও তার সুখ নেই, দুঃখেরও কোন অনুভূতি নেই। সুনির্মল ভালোবেসেছে দিদিমণি সরসীকে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে সে মুক্তি চায়। ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি পুলিশ অফিসার বদলি হয়ে যায়। 'শ্রীমতী কাফে'র উপর আগের মতো কড়া নজর নেই, নজর এখন প্রিয়নাথের উপর।

'শ্রীমতী কাফে'তে গল্পখোর গোলোক চাটুজ্যের মতো আর একজন নিয়মিত খদ্দের ভবনাথ বাঁড়ুজ্যে। তিনি বিপত্নীক। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে পার্শেল ক্লার্ক। 'শ্রীমতী কাফে'তে তিনি ভজুকে সঙ্গী করে গোপনে মদ খান। ছেলেদের ব্যবহারে ও আচরণে তিনি হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তিনি ছেলেদের আচরণে দুঃখ ক'রে বলেন — "চাকরি, বিয়ে, সংসার - এ সবের মধ্যে না ঢুকিয়ে ছেলেটিকে যদি অমানুষ করে ফেলতাম। একবার দেখতাম তা হলে কী পরিণতিটা হয়। অর্থাৎ ও নিজের জীবনটা কীভাবে গড়ে, সেটা একবার দেখতাম।" ভজু অনুভব করতে পারে এ সব ভবনাথের মদ খেয়ে মাতলামি নয়, এ সব তাঁর অন্তরের যন্ত্রণা, ব্যথা। আদর্শহীন কাপুরুষ ছেলেদের নিয়ে ভবনাথ আক্ষেপ করেন। ভজুর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন — "ক্ষুদিরাম বলে এক বাঙালির নাম শুনেছে, তাকে সরকার ফাঁসি দিয়ে খুন করেছে। তোমার দাদা নারায়ণ হালদারের কত কথা বলেছে। ভাবি, এ মহাজীবনের এই মহামরণের পথেও যদি আমার ছেলেরা যেত ? ছেলেদের আদর্শে ভবনাথের ঘেন্না ধরে গেছে। তিনি একটু হাওয়া চান তার গুমোট ঘরে। সমালোচক নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন — "এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলিই মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল — দেশ ও ব্যক্তিগত সকল দিক থেকেই। দেশের নামে ভণ্ডামি, কদাচার ও কাপুরুষতার মুখোশ লেখক আগেই ভজুর মাধ্যমে খুলে দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের নিরাপদ নিশ্চিন্ত চাকুরে জীবন যাপন করে অবসরপ্রাপ্ত ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভজুলাটের কাছেই ছুটে আসেন জীবনের তাৎপর্য কোথায় নিহিত তার সন্ধানে। তার বিপথগামী ছেলেরা যদি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে প্রাণও দিত তবু তার বিন্দুমাত্র আফসোস থাকত না।"[১৩৪]

শ্রীমতী কাফের পিছনে প্রিয়নাথ বাঙালিদের নিয়ে দলের সভা করে। শ্রমিক ভাগন ও মনোহর যোগ দেয়। ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করে এই সভাতে। ভজুর মনে হয় বিশ্বের কোথাও এরা ঠাঁই পায়নি,

পেয়েছে শুধু ভজুলাটের 'শ্রীমতী কাফে'তে। কানপুরের সুরজ সিং এখন এ অঞ্চলের বাসিন্দা। ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক সে। রাজনীতিতে ব্যর্থ হীরেন শ্রীমতীতে এসে ভজুকে বলে — "দেখ ভজু, যেদিন রাজনীতি করতে এসেছিলাম, সেদিন কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলুম। ভাবি, এত যে ছুটে চলেছি, জেল খাট্‌ছি, কী পেয়েছি। এতো সবই দলীয় রাজনীতির চূড়ান্ত ইচ্ছে। কিন্তু ভারতের সেই মহাতীর্থ রূপটি কোথায় তাঁকে তো দেখতে পাইনে। জানো, এক সময়ে ভাবতুম ভারতের সব নারীই বুঝি মহাশ্বেতানাঃ, আমি চলে যাবো ভাবছি সরে যাব এসব থেকে।" ভজু প্রতিবাদ করে হীরেনকে বলে — কোথায় পালাবে ? ভজু তাদের সমাজ সংস্কারের নামে ধাপ্পাবাজিকে মেনে নেয় নি। ভজু তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে — "আগামী দু-চার বছরে তোমরা আরও ক্ষমতা পেতে পারো, এমনকি তুমি কৃপাল, তোমার সবাই কর্তা হতে পারে, কিন্তু জেনো সেটাই শেষ নয়। তোমরা ভেক্ নিতে পারো, সাধু হতে পারো না।" ভজু অনুতপ্ত, সে অনুশোচনা করে বলে — " আমি ভজু, ভজু লাট মাতাল। আমাকে সকলে হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছে। দিক্, দোষ দেব না ..... দেখো, ছোটকালে বাবাকে দেখেছি মাতাল, প্রতিবেশিকে দেখেছি স্বার্থপর।" মা বাবার প্রতি তার বিশ্বাস ছিল না। মায়া ছিল না নিজের প্রতি। তাই প্রথম দিন থেকে সে নির্ভয়ে মদ খেয়েছে। ঋণে জর্জরিত হয়ে আত্মযন্ত্রণায় সে ছট ফট করে বলে — "সংসারে আগে পেছনে সমস্তটা শূন্য। এ শ্রীমতী কাফে চোরা বালুর উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমি দেনায় তল হয়ে আছি। তোমরা বলবে এ শুধু আমার দোষ, কিন্তু পারিনা। সকলের মুখে আমাকে অন্ন তুলে দিতে হয়, শ্রীমতীর রোজগার আমাকে সবটুকু পোষাতে পারেনা আর বাবা .....।"

ভজু মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। এনিয়ে যুঁইএর কোন অভিযোগ নেই। যুঁই শুধু উদ্বিগ্ন ভজুর শরীর নিয়ে। ভজু আবেগে যুঁইকে বলে — "আচ্ছা যুঁই, এই কী চেয়েছিলে ? তোমার জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন, একদিনও কী এ রাতের কথা ভাবতে পেরেছিলে ? যুঁই সত্য জীবনে কল্পনা করেনি। ভজুর বুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে আজ সে আকুল। ভজু যুঁইকে বলে — "পারোনি, আমি জানি, কেউ পারেনা। এ সংসার তাই। কিন্তু একলা আমাকে দোষ দিওনা যুঁই। দোষ যদি দাও, অভিশাপ যদি দাও, তবে এ পুরুষ শাসিত সমাজকে দিয়ো। তুমি এ অন্ধ ঘরের কোণে পড়ে থাকো, তবু জানি কী আগুন লুকানো আছে তোমার বুকে। যদি কোনও দিন আগুন জ্বালো, তা হলে সারা বিশ্বকে জ্বালিয়ো।"

কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষ বসুর মতান্তরকে কেন্দ্র করে বাংলা কংগ্রেসে বামপন্থীর ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কৃপাল দুপক্ষের সমর্থক। সুনির্মল ও সরসী রায়ের প্রেমকে সে সমর্থন করে না। জালিওয়ানাবাগ দিবসকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীরা ছাত্র ধর্মঘট আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। বিপ্লবীরা শ্লোগান দিচ্ছে — "বন্ধুগণ, ছাত্রবন্ধুরা, এ সেই মিথ্যে ইতিহাস অন্ধকূপ হত্যার কাহিনি নয়, আজকের দিনেই দিনেরবেলা ইংরাজ হত্যা করেছিল ভারতীয়দের। পাঞ্জাবের ঘেরা বাগানের চার দিক থেকে বন্দুকের গুলিতে।" পুলিশ আক্রমণ করে ছাত্র আন্দোলনের উপর। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ছাত্ররা। কৃপাল হীরেনের হাত থেকে গীতাখানি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পুলিশ গীতার উপর দিয়ে, থেঁতলে মার্চ করে চলে যায়। পুলিশের আঘাতে একটি ছেলে ছিটকে এসে পড়ে ভুনুর গাড়ির সামনে। ভুনুর স্ত্রী মুনিয়া তাকে তুলে নেয় গাড়িতে। ভুনু ছেলেটিকে (কানুকে) নিয়ে আসে 'শ্রীমতী কাফে'তে। ভজু ওকে বুকে টেনে নেয়। চরণকে নির্দেশ দেয় ছেলেটিকে (কানুকে) এক গ্লাস দুধ দিতে। ভজু এর আগেও কানুকে মাংস খাইয়ে ছিল। অথচ ভজুর নিজের সন্তানেরা বাড়িতে দুধ পায় না। ভজু কানুকে বলে তোর জন্য শ্রীমতীর দরজা চিরদিন খোলা রইল। ভজু কানুকে জিজ্ঞাসা করে নারায়ণ হালদারের নাম শুনেছে কি না। কানু বলে রথীনের কাছে সে শুনেছে, নারায়ণ তাদের গুরুদেব। ভজু খুশি হয়ে কানুকে ড্রয়ার থেকে একটি কাল মার্কসের বই দেয়। কানু জিজ্ঞাসা করে — "ইনি কোথাকার ঋষি ?" ভজু বলে বিশ্বের। "বইটা তোদের গুরুদেবের ঝোলায় অর্থাৎ নারায়ণের ব্যাগে পড়েছিল। আমি তোকে দিলুম, তুই পড়বি।" পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন — "এভাবেই ভজুলাট পরম্পরা গড়ে তোলে, নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেয় কার্ল মার্কসকে — দাদার পরম্পরাকে প্রসারিত করে, প্রসারিত করে না কি তার স্বপ্নকেও ? এভাবেই ভজন, ভজুলাট হয়ে ওঠে সদর্থক চরিত্র। মুক্তি না পেয়েও মুক্তির পিয়াসি।"[৩৫] বিনা অনুমতিতে পুলিশ 'শ্রীমতী'তে প্রবেশ করে তল্লাশির জন্য। পুলিশের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ভজু বলে — এখানে লুকিয়ে আছে সি. আর. দাস, রবীন্দ্রনাথ, র‍্যাফেলের মা-ছেলে আর সিরাজদৌল্লা এবং ভজু নিজেকে দেখিয়ে বলে আমিও লুকিয়ে আছি, খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভজু সত্য পালিয়ে গেছে তার সন্তান-স্ত্রীর কাছে থেকে।

ভুনুও স্বদেশী। যদিও সে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে যোগ দেয়নি। সে আন্দোলনকারী বিপ্লবীদের সমর্থন করে। ভুনু পুলিশের আক্রমণের হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুনুর স্ত্রী মনিয়া রেগে ভুনুকে বলে — "কেন, কেন গোঁযার কাঁহিকা।" ভুনু মনিয়ার হাত দুটো ধরে বলে — "বুজদিল আওরত।

আমি তোর মরদ ভুনু নয়। অতগুলো ছোকরাকে পুলিশ মারবে, আমাকে আটকাতে হবেনা।" ভুনু নিজে নিজে বানিয়ে বলে — "এটা আজাদির লড়াই জানিসনা ? মহাত্মা গাঁধী আছে না ? উনকে জেলে নিয়ে গেছে তাই। লারাইন ঠাকুর ফের আসবে কিনা, ছোকরারা সে দেউতাকে ফিরিয়ে আনতে চায়।" সুনির্মল বিয়ে করেছে বিধবা সরসীকে। স্কুল কমিটি তাকে স্কুলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। কানু রথীনদের সঙ্গে 'শ্রীমতী কাফে'র পেছনে বৈঠক করে। ভজুকে কানু প্রণাম করে বলে বইটা আমি পড়েছি, অনেককে দিয়েছি পড়তে। আমাদের পথকে কেউ রোধ করতে পারবে না। মদ্যাসক্ত ভজু ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসীম সমুদ্রের দ্বীপ থেকে আসা নারায়ণের চিঠি হাতে নিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ভজুর মৃত্যুর পর 'শ্রীমতী কাফে' সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে। প্রিয়নাথেরা ঘর ছাড়াদের মতো ঘুরে বেড়ায়। ভজুর ছেলের তত্ত্বাবধানে 'শ্রীমতী কাফে' আবার খোলে। ভজুর চেয়ারে বসে গৌর। শুরু হয় 'শ্রীমতী কাফে'র আর এক পর্ব। ১৯৪৮ সালের শেষের দিক। ঘটে গেছে সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আর মন্বন্তর। শত শত মানুষ শহিদ হয়েছে। মরেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে ও ছেচল্লিশের আজাদ হিন্দ দিবসে। শ্রীমতীর চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে। যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। শ্রীমতীর বেশির ভাগ ছবি নেই। নেই ভজুর প্রিয় ছবি রবীন্দ্রনাথ, মেরিমাতা, সিরাজদৌল্লা, র‍্যাফেলের মা ও নারায়ণের ছবি। ঘড়িটার লেখাগুলো ক্ষয়ে গেছে। ঘড়ির নীচে একটি কাগজে লেখা রয়েছে, 'লিকার স্ট্রিকটলি প্রোহিবিটেড'। শ্রীমতীর বাবুর্চী হয়েছে ভজুর ছেলে নিতাই। কংগ্রেসের আর কেউ আসে না 'শ্রীমতী কাফে'তে। হীরেন থাকে কলকাতায়। কৃপাল কংগ্রেসী এম. এল. এ., সে আর শ্রীমতীর দিকে ফিরে চায় না। কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকার বেআইনি ঘোষণা করে। প্রিয়নাথ আত্মগোপন করে। 'শ্রীমতী কাফে' শুধু হাত বদল হতে থাকে। অথচ যুঁইদের উপার্জনের একমাত্র ভরসা 'শ্রীমতী কাফে'। নিতাইয়ের একটি পা কাটা। সে ক্রাচটি বগলে দিয়ে প্রায় নিরালা গঙ্গায় যায়। বাবাকে তার খুব মনে পড়ে। 'শ্রীমতী কাফে'তে কোন রাজনৈতিক দলের সভা আর হয় না। তবুও পুলিশ 'শ্রীমতী কাফে'কে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে। তীক্ষ্ণ সন্দেহান্বিত চোখে তাকিয়ে দেখে এক পা ওয়ালা নিতাইকে। মানুষ না থাক 'শ্রীমতী কাফে'র ইঁটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইন্ধন। কমিউনিস্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। প্রিয়নাথ নতুন করে জাপান-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। নারায়ণ আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে। ভজু নেই, সংসারের অচল অবস্থা। নিতাই পঙ্গু, গৌর বিপথে গেছে। ভজুর অপর ছেলে মণ্টু সাইকেল মেরামতের কাজ

করে। অর্থের অভাবে পড়া-শুনা ছেড়ে দিয়েছে। নারায়ণ অন্ধকার দ্বীপ থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে নতুন করে গৃহবন্দী হয়েছে। সংসারের কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য সে আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ। তাই সে সংকোচে বলে — "না বউ না, আমি চেষ্টায় আছি। মানে, সংসারের সব ব্যাপার তো সব সময় বুঝে উঠতে পারিনে তাই একটু।" অনেকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, প্রতীক্ষা করে আছে অনেকে তার জন্য। যুঁই নারায়ণকে সংসারের বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিতে চায়। নারায়ণকে সে বলে — "আপনার সংসার তো শুধু এটা নয়, আরো অনেক আছে।" এভাবে সব ছেড়ে দিয়ে আপনাকে আমি ঘরে বসে থাকতে দেব না। আপনার জন্য এত মানুষ বসে আছে। সমালোচক নিমাই বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যথার্থ বলেছেন — "তিনি বিবাহ করেননি, সংসারের দাবী থাকলেও দেশমাতৃকার আহ্বান তাঁর কাছে আরও অনেক বড় বলে মনে হয়েছে। তবু সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে পারেননি বলে তাঁর মনে অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। অল্প বয়সে মাতৃহারা, উদাসীন মদ্যপ পিতা মামলাবাজিতে নিঃশেষ - এ হেন পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরা তাঁর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বুকে যাঁর দেশপ্রেমের আগুন জ্বলেছে, তাঁর পক্ষে সংসারের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আটকে থাকা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।"[৩৬] ভজুর বিয়ে দিয়ে, নারায়ণ সংসারের ফাঁকটুকু ভরাট করতে চেষ্টা করেছিল, তাতে বিবেকের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে নারায়ণ মাঝে মাঝে ভজুর স্ত্রী যুঁইয়ের কাছে তার সাংসারিক কর্তব্যচ্যুতির ত্রুটি স্বীকার করে। ভ্রাতৃবধূ যুঁই বিপ্লবী নারায়ণকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেনি। সংসারের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত করেছে।

নারায়ণ প্রমীলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করার। আন্দামান থেকে সে ভজুকে চিঠিও লিখেছিল — আন্দামান থেকে ফিরে সে প্রমীলার সঙ্গে দেখা করবে। প্রমীলার মৃত্যু সংবাদে নারায়ণ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। মনে পড়ে যায় তার প্রমীলার কথা — "একবার যদি তুমি না আসো, তা হলে জীবনের সবটাই বাকি থেকে যাবে।" প্রমীলা মৃত্যুর পূর্বে ছেলে নবীনকে সঁপে দিয়েছে নারায়ণের আদর্শ।

নারায়ণ 'শ্রীমতী কাফে'র দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল যতীশের হাতে। সেও ছিল কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী। প্রিয়দের আড্ডাস্থল গড়ে ওঠে 'শ্রীমতী কাফে'। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কানু, বাঙালি, মনোহর, ভাগন কারাবন্দী হয়। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি — "পীযুষবাবু প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী এবং তৎকালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রায় সদস্য। বাসন্তী

কেবিনের মালিক হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর হলে তাঁর নাবালক পুত্ররা দায়িত্ব নেবার মতো উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই তত্ত্বাবধায়ক পরম্পরায় রেস্তোরাঁটি চালিত হয়েছে। পীযুষদা ছিলেন বাসন্তী কেবিনের প্রয়াত মালিক হরিবাবুর ভাই চব্বিশ পরগণা কম্যুনিস্ট পার্টির জেলাস্তরের নেতা সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুরানো সহকর্মী।" [৩৭]

নবীন গাঙ্গুলী কংগ্রেসের এম. এল. এ.। হীরেন কলকাতায় থাকে। সে ভারতের তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। বউদিও কলকাতায় থাকে। সে কংগ্রেসের নেত্রী। যতীশবাবু 'শ্রীমতী কাফে'র মালিক। ভজুর ছেলে নিতাই 'শ্রীমতী কাফে'র বাবুর্চি। সশস্ত্র পুলিশ তল্লাশি করে 'শ্রীমতী কাফে'। ভজুর জীবিত থাকা কালে সেই ছোকরা পুলিশ অফিসার 'শ্রীমতী কাফে'তে মাথা উঁচু করে ঢুকতে পারেনি। এতদিন যাদের তিনি এখানে ধরতে এসেছিলেন, আজ তাদের হুকুমে অর্থাৎ এম. এল. এ. নবীন গাঙ্গুলী ও কৃপালের নির্দেশে তল্লাশি করতে এসেছেন। চারের দশকের শেষে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে পুলিশ 'শ্রীমতী কাফে'র তালা বন্ধ করে দেন। নিতাই রাগে ক্ষোভে দুঃখে — "পেছনের ঘরে ক্রাচের খট খট শব্দে চলে গেল। জল ঢেলে দিল সদ্য জ্বলা উনুনে। খাঁচায় একটা মুরগী ছিল। ছেড়ে দিল সেটাকে বাজারের পেছনের দিকে।" পুলিশ অফিসারটি নিতাইকে করুণা করতে চান, আসতে বলেন কলকাতায়। গর্ভনমেন্টএর সঙ্গে আলোচনা করে 'শ্রীমতী কাফে'টি খোলার প্রস্তাব দেন। ভজু কখনো মাথা নত করেনি পুলিশের কাছে। অপমান করেছে এই পুলিশ অফিসারকে। তাই পুলিশ অফিসার নিতাইকে করুণা করেন, আবার মাথা উঁচু করে শ্রীমতীতে ঢুকতে চান। প্রতিবাদী নিতাই পুলিশ অফিসারের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। নিতাই "কোনও কথা না বলে, খুব জোরে পিচের রাস্তায় ক্রাচের শব্দ তুলে চলে গেল সে। খট্ খট্ খট্ ..... অফিসারটি চাপা অস্ফুট গলায় খালি বললেন — "সাপের বাচ্চা, শলুই ননসেন্স।" নিতাই অনাহারে থাকতে প্রস্তুত, তবু সে মাথা নত করেনি। এবারও পুলিশ হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায় প্রতিবাদী নিতাই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন — "এ প্রতিবাদী ফণাধর মূর্তিই ভজনের ছেলের আসল চেহারা। শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে যে অবজ্ঞা ভজন জানিয়েছিল, তার ছেলের রক্তকোষেও সেই ধিক্কার। ভজনের উদ্দেশ্যে এর চেয়ে বড়ো শ্রদ্ধাঞ্জলি আর কি হতে পারে ?"[৩৮] সমালোচক হিতেন্দ্র মিত্র প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী ভজু চরিত্র সম্পর্কে এই অভিমত পোষণ করেছেন — "ভজুলাট চরিত্রের মধ্যে সমরেশ মধ্যবিত্ত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,

পরাধীনতার জ্বালাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। 'শ্রীমতী কাফে'র ইতিকথায় যে রাজনৈতিক ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে তা প্রসৃত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদ থেকে সাম্যবাদ পর্যন্ত।"[৩৯] এ উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই উপন্যাসে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ❑

৫

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি লেখক দেশভাগকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। উপন্যাসের সময় কাল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ জুলাই অর্থাৎ স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্‌মুহূর্ত থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ স্বাধীনতার উত্তরকাল পর্যন্ত। সমালোচক বলেছেন — "ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, না এখনও পরাধীন থাকবে, দেশ ভাগ হবে, না অখণ্ডই থাকবে, তার ভাগ্যনির্ধারণ হবে অনুদার ধর্মীয় সংকীর্ণতার দ্বারা, না অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিকতার দ্বারা — এইরকম একটা অনিশ্চিত দোলাচলতার অস্থির সময়কে তুলে ধরা হয়েছে 'সত্তদাগর' উপন্যাসের সূচনা পর্বে।"[৪০] চল্লিশের দশকে লেখক সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ করেছেন দেশভাগের ফলে ওপার বাংলা থেকে মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে এপার বাংলায় এসেছে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি। এই উপন্যাসে নায়ক মেঘনাদ সাহা ওরফে মেঘু। নায়ক মেঘু দেশভাগের ফলে স্বজন বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরেও নিজের অপরাজেয় সত্তাকে বিসর্জন দেয় না। শৈশবে সে তার মাকে হারিয়েছে এবং তেরো বছর বয়সে হারিয়েছে বাবাকে। মেঘুর বাবা মদন সাহা অর্থের জন্য জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিল। অর্থের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছে। ভাগ্যান্বেষণের জন্য ছুটে গেছে সুদূর আসামের পাহাড়ের জঙ্গলে। ছিল না তার মূলধন। নিজের শেষ সম্বল ভিটেমাটি বন্ধক রেখে প্রতিবেশী ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ সাহার কাছে অর্থ ঋণ করেছে। পিতার মৃত্যুর পর মেঘনাদ অর্থাৎ মেঘু সর্বস্বহারা হয়েছে। দিন কাটাতে হয়েছে অনাহারে। সাহা বংশের রক্ত বার বার তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, ব্যবসা করতে হবে, গদিতে বসাতে হবে, সিন্দুক ভর্তি টাকা উপার্জন করতে হবে। পিতার মৃত্যুর পর মেঘু আত্মযন্ত্রণায়

ভুগেছে, নিজেকে মনে হয়েছে সাহা বংশের কলঙ্ক। জীবনের সমস্ত সুখের বিনিময়ে কাঞ্চন সঞ্চয় সাহা বংশের ধ্যান ও জ্ঞান। পিতার মৃত্যুর পর শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। সামান্য পারিশ্রমিকে প্রতিবেশী ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ সার গদিতে কাজ পায়। গদিতে ঝাঁট দিতে হয়, জল তুলতে হয়। শুধু গদিতে নয়, ফাইফরমাস খাটতে হয় তাকে লক্ষ্মণ সাহার অন্দরমহলেও। গদিতে ঝাঁট দিতে দিতে সে স্বপ্ন দেখে, সে ধনপতি হবে। ধনপতি সওদাগরের মতো সে পৃথিবীর হাটে হাটে বাণিজ্য করবে। ভেসে উঠত তার চোখে সমুদ্রের ঢেউ, সপ্ত ডিঙ্গা। হিরে জহরত ধনরত্ন নিয়ে ঘরে ফিরবে। প্রতিবেশী বউ ও মেয়েরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করবে, অভিনন্দন জানাবে। মেঘু সাহার বংশগত ব্যবসা ছিল শীতল পার্টির মাদুর ও হোগলা রপ্তানির। কিন্তু ঠাকুরদার আমলে বংশগত ব্যবসা রসাতলে চলে যায়। একদা মেঘুর পিতা মদনসা ঋণগ্রস্ত হয় লক্ষ্মণ সাহার কাছে। গদিতে সামান্য ক্ষতি হলে বিনা অপরাধে বিনা বিচারে গণৎকার নসীরামের নির্দেশে মেঘুকে লক্ষ্মণসা অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। নসীরাম গণনা করে দেখেছে গদীতে মৃত মদনসার অলক্ষ্মীর ছায়া লেগেছে। ভাগ্যের পরিহাসে তাকে আবার নামতে হয় পথে। নিরপরাধ মেঘুর অব্যক্ত দুঃখ যন্ত্রণা শুধু লালমিঞা ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারে না। লালমিঞা তাকে তার বিস্কুটের কারখানায় কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল। তবু রাগে, দুঃখে, অভিমানে মেঘু গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। জীবনের প্রতি আসে অনীহা, বিতৃষ্ণা। হতাশায় সে নদীতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। শুনতে পায় দৈববাণী তথা মৃত পিতার লক্ষ্মী সন্ধানের নির্দেশ। ধনপতি সওদাগরের মতো সে লক্ষ্মী সন্ধান করে। বেঁচে থাকার তাগিদে কখনো সে করেছে ভৃত্যের কাজ, কখনো হয়েছে ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গী, কখনো বা হয়েছে মাঝির সহকারী, করেছে বন্দরের কুলির কাজ। পরিশেষে সে ঢাকা শহরে রুটি ও বিস্কুটের কারখানায় কাজ করেছে। সংগ্রাম করে সে এগিয়ে গেছে, পেয়েছে সাফল্য ও করুণা। মনে পড়ে তার অতীতের কথা। গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন দেখে সে আবার নতুন করে। মনে পড়ে যায় জন্ম স্থানের কথা, ঋণের দায়ে বন্ধক রাখা ভিটের কথা। সমালোচক তাই বলেছেন — "আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত চারিত্র্যবল নিয়ে বাবার স্বপ্ন ও নিজের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে সে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। সে ধনপতি সওদাগর হবে।"[৪১]

সঞ্চিত অর্থ নিয়ে সে ফিরে আসে নিজের জন্মস্থানে। লালমিঞা তাকে দেখে খুশি হয়। তবে লালমিঞার পূর্বের মতো অর্থ ও কারবার নেই। সহোদর ভ্রাতাদের চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতায় সে প্রায়

সর্বস্বান্ত। জীবন সায়াহ্নে এসে সে নতুন করে তৈরী করে ছোট তন্দুর, হাত লাগায় কারখানার কাজে। মেঘু লালমিঞার কারখানায় নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। সে লালমিঞাকে প্রতিশ্রুতি দেয় শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও কারখানার কাজ চালিয়ে যাবে। নতুন আশা নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু করে সংগ্রাম। প্রতিবেশীদের অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে সে। আবার লালমিঞাকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদেরও মুখোমুখি হয়েছে। লালমিঞার নির্দেশ পালন করে ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা ক্রমশ সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। কারণ সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয় তার আশা। অতীতের ঠক প্রবঞ্চক লক্ষ্মণসা তার নাতনির সঙ্গে মেঘুর বিয়ের প্রস্তাব দেয়। লোভ দেখায় অর্থের, যৌতুক হিসাবে দিতে চায় পিতৃঋণে বাঁধা ভিটেটুকু। কিন্তু আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মেঘু কোন লোভে প্ররোচিত না হয়ে বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে। সে ভুলে যায়নি অতীতের স্মৃতি। বিনা অন্যায়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লক্ষ্মণসা তাকে পথে বসিয়েছিল। সে আবার সর্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরতে প্রস্তুত, তবু সে লক্ষ্মণসার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায় না।

একদা লালমিঞা ধনি বাঙালি মুসলমান ছিলেন, এখন সেই ধনের সামান্য অবশিষ্টটুকুও নেই। সে ছোট তন্দুরের মালিক। সে সৎ ও আদর্শবান। মেঘুকে সে সততার পথে ব্যাবসা করতে নির্দেশ দিয়েছে। মেঘু যখন অসৎ পথে অন্যায়ভাবে অপর ব্যাবসায়ী বদরুদ্দিনের দক্ষ কারিগর মনোহরকে নিজের কারখানায় নিয়ে আসে, তখন লালমিঞা মেঘুর এই অসৎ প্রবৃত্তিকে সমর্থন করেনি। প্রতিবাদ করেছে সে। লালমিঞার নির্দেশে মেঘু নতুন বাড়ি তৈরি করে। গণৎকার নসীরাম নতুন করে মেঘুর ভাগ্য নির্ধারণ করতে চায়। একদা তার নির্দেশে মেঘু কর্মহীন হয়েছিল, তাকে বহন করতে হয়েছিল মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক। নসীরাম মেঘুকে গদি ও কারখানা শুদ্ধিকরণের উপদেশ দেয়। মেঘু তার আদেশ অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করে। সৎ পথে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করা শুচি হওয়ার বড় পথও— এই মন্ত্র লালমিঞা মেঘুকে দিয়েছে। মেঘু এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। স্বল্প সময়ের মধ্যে মেঘুর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠে। বৃদ্ধি পায় কর্মচারীর সংখ্যা ও কারখানার মালের চাহিদা। সে সোনাদুলির চরের নকুর সার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মেঘুর স্ত্রীর নাম লীলা ওরফে ঝুমি। মেঘু পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন ক'রে ধনী হতে চায়। তাই সে লক্ষ্মণসার অর্থের লোভে প্ররোচিত না হয়ে গরীব অখ্যাত পরিবারের লীলাকে বিবাহ করে। মেঘুর জীবনের ধ্যান জ্ঞান কারখানা ব্যবসা। তাই সে বিয়ের ফুলশয্যার রাতেও কারখানার

কাজ কর্ম নিয়ে কারিগর বিপিনের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত থাকে। রাত দুটোর সময় ঘরে প্রবেশ করে নববধূর শয্যার সঙ্গী হয়ে বিস্কুটের উপকরণ নিয়ে আলোচনা করে। নববধূ লীলা ওরফে ঝুমি স্বামীর আচরণে দুঃখ পায়, অভিমান করে সে। স্বামীকে সে অতীতের কলঙ্ক ভুলে নতুন করে পেতে চেয়েছিল। লীলা যুবতী অবস্থায় পশুবৃত্তির এক পুরুষের কামনার শিকার হয়েছিল। সেই ঘটনা তার মনে পুরুষ সমাজের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল। ফুলশয্যার রাতে স্বামীকে সে নতুন ক'রে কামনা ও বাসনার মধ্যে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু মেঘুর আচরণ লীলার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। স্ত্রীর কামনা-বাসনা রাগ-অভিমান সে কিছুই বোঝে না। শুধু বোঝে সে বিত্ত, কাঞ্চন, কারখানা ব্যাবসা। দাম্পত্য জীবনে লীলা ক্রমশ হয়ে ওঠে তিক্ত। স্বামীর ব্যাবসার সাফল্যে তার কোন উৎসাহ নেই। সে প্রতিনিয়ত স্বামীর ব্যাবসার সর্বনাশ কামনা করে। ঘরের মায়ার বন্ধন লীলাকে গৃহকোণে আবদ্ধ করতে পারেনি। সে নিজের সীমা অতিক্রম ক'রে কারখানার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মতবিরোধ ঘটে স্বামী মেঘুর সঙ্গে। ক্ষুধার্ত যৌবনের তৃষ্ণায় লীলা পিতার সমবয়সী কারিগর বিপিনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়তে চায়। বিপিনকে সে দৈহিক কামনায় উদ্দীপ্ত করেছে। লীলার প্রতিনিয়ত সন্দেহ হতো স্বামী মেঘু তাকে প্রেম ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই সে স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। লীলা যেন মনসার মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মনসাকে পুজো না দেওয়ার জন্য মনসা যেমন চাঁদ সদাগরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, লীলাও স্বামীর প্রেম ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে তার প্রতিপত্তি, যশ প্রভৃতিকে ধ্বংস করতে চায়। সমালোচক যথার্থ বলেছেন — 'কালো সুন্দরী' লীলা সোনাদুলির চরের মেয়ে - চরের মেয়েদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুরা সম্পর্ক পাতাতে চায় না। তাদের বংশের প্রাচীনত্বের গৌরব নেই। মনসার মতই সে অন্ত্যজ। এখানে বিশ্বাস ও সংস্কৃতি শিথিল, জীবন উদ্দাম, ভয়হীন। চরের প্রকৃতির মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতা। এই প্রকৃতির মধ্যে লীলাও ধর্ষিতা হয়েছিল।"[৪২] লীলা স্বামীর সাফল্যকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গে নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত হল — "মনসার পূজা না করার জন্য চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী যেমন ডুবেছিল, একে একে সব পুত্রকে সর্প-দংশনে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, তেমনি মেঘনাদও ব্যাবসা বাণিজ্যে সবসময়ে ডুবে থেকে লীলার তপ্ত প্রেমালিঙ্গনকে অস্বীকার করার জন্য, মেঘনাদের জীবনে লীলা ধ্বংসের করাল মূর্তি রূপে দেখা দিয়েছিল। তাই কোপনাস্বভাবা মনসার মতোই লীলা হিংসার বিষ ঢেলেছে। মেঘনাদের

ব্যবসার ভরা ডুবি চেয়েছে সে। এমনকি, অবদমিত ক্ষুধিত যৌবন নিয়ে পরপুরুষের দিকে লালসার বাহু বিস্তার করেছে।"[৪৩] আর মেঘনাদ কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের মধ্যদিয়ে বিত্ত আহরণের মাধ্যমে জীবনের আনন্দকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। মেঘু তার স্ত্রী ঝুমির নামে বিস্কুটের নাম রাখে, কিন্তু স্ত্রীর মনের আনন্দের জগতের কোন খোঁজ রাখে না।

১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে মেঘনাদের জীবনের আবার গতি পরিবর্তন হয়। একদিকে জাতিদাঙ্গা, অন্যদিকে কালোবাজারির ফলে বাজারে ময়দার কৃত্রিম অভাব দেখা যায়। বিস্কুটের উপকরণের অভাবে মেঘুর কারখানা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। লালমিঞার চেষ্টায় ময়দার সাময়িক চাহিদা মিটেছিল। বিনিময়ে তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে এক মুসলিম সাহেবকে। ঘুষ দেওয়াকে সে সমর্থন করে না। শিক্ষিত সমাজের প্রতি তার হীন ও ঘৃণ্য ধারণা জন্মে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ময়দার অভাবে বদরুদ্দিনসহ একাধিক ব্যক্তির বিস্কুটের কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মেঘনাদ নতুন করে স্বপ্ন দেখে, সে ঢাকা শহরে ইংরেজ কোম্পানির মতো মেসিন বসিয়ে বড় কারখানা গড়বে। ১৯৪৭ সালে মধ্য রাত্রিতে দেশ ভাগ হয়। দেশভাগের ফলে কারখানা, গদি, ঘর-বাড়ি ফেলে প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে সে এপার বাংলার পাড়ি দেয়। মানসিকভাবে সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দেশভাগকে সে মেনে নিতে পারেনি। স্ত্রী লীলা দুঃখ পায়নি, বরং সে খুশি হয়েছে। সে তো স্বামীর এই সর্বনাশ প্রত্যাশা করেছিল। স্বামীর কারখানা চূর্ণ হবে, ধ্বংস হবে। মেঘনাদ অহংকার, নাম, যশ হারিয়ে কর্মহীন হয়ে তার প্রতি নজর দেবে। লীলা আনন্দে বাক্স গোছায়, জীবনকে সে নতুন করে উপভোগ করতে চায়। সে শুধু জানে দেশভাগ হবে। কিন্তু কার নির্দেশে স্বামী মেঘনাদ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তা সে জানে না। মেঘনাদের মনে হয় মৃত লালমিঞা তাকে আবার অর্থের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে। সে স্ত্রী লীলাকে নিয়ে এপার বাংলা কলকাতার নিকটে শ্বশুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঘনাদ যেন রাজ্যহারা ছদ্মবেশী রাজা। সাময়িকভাবে সে হতাশ ও নিরাশ হয়েছিল। কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করেনি। নতুন ক'রে সে আবার কারখানা গড়ার স্বপ্ন দেখে। মেঘুর হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা লীলা অনুভব করতে পারেনি। স্ত্রী লীলার প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এপার বাংলাতেও মেঘনাদ স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেনি। জামাই মেঘনাদকে পেয়ে শ্বশুর নকুরসা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। মেঘনাদের মতো একদা নকুরসা সর্বস্ব হারিয়ে এপার বাংলায় এসেছিল। বৃদ্ধ আশাবাদী, সে স্বপ্ন দেখে ব্যাবসা ও গদির। মেঘুকে আশ্বাস দেয়, সান্ত্বনা দেয়। মেঘুও

নতুন করে পাল তুলে সপ্তডিঙ্গা জাগাতে চায়। নতুন করে লক্ষ্মী ঠাকুরের ঘট পাততে চায়। পুজো দিতে চায় সিদ্ধিদাতা গণেশের। জীবনে সে মার খেয়েছে বার বার। তবু সে পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। মেঘুর শ্বশুর নকুরসা সাংসারিক জীবনে চরম ব্যর্থ। শেষ জীবনে সে জামাইকে আঁকড়ে ধরে নতুন করে অর্থের সন্ধান করতে চায়। মেঘু হতাশার মধ্যে শ্বশুরের স্নেহের স্পর্শ পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। সে শ্বশুর নকুরসার চরিত্রের মধ্যে লালমিঞার সাদৃশ্য পায়। তার বিপদের দিনে লালমিঞা ছিল পাশে, দিয়েছিল সাহস ও ভরসা। মেঘু দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় বাড়ি ঘর কারখানা গদি দেখার দায়িত্ব বিপিনকে দিয়ে এসেছিল। বিপিন মেঘুর পুরানো বিশ্বস্ত কারিগর। নকুরসা বিশ্বাস করতে পারেনি বিপিনকে। সমর্থন করেনি সে বিপিনের উপর সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণকে। মেঘু লালমিঞার আদর্শে বিশ্বাসী। সে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চায় না।

মেঘনাদ বাজারে বিস্কুটের কারখানা তন্দুর দেখে। তার মনে পড়ে যায় ফেলে আসা গদি ও কারখানার কথা। লীলার ভাই বিজয় মেঘুর সর্বস্ব হারানোর দুঃখ ও অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে। বিজয় পেশায় চটকলের উইভিং মিস্ত্রি। সে বোনাই মেঘুকে শহর-হাট-বাজারের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। পরিচয় হয় বিস্কুটের কারিগর ইদ্রিস আলীর সঙ্গে। সে শুধু কারিগর নয়, দক্ষ মিস্ত্রীও। সে অনুপ্রাণিত করে মেঘুকে কারখানা খোলার, প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে সাহায্যের। মেঘু পাঁচ টাকা ভাড়ার ছোট একটি ঘরে শুয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে। সে যেন এক ব্যর্থ সওদাগর। তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; সে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সংশয় আর সন্দেহে ভরা। নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় সে। বিজয় বোনাই মেঘুর মনে নতুন করে আশার আলো সঞ্চারিত করেছে। সে মেঘুকে পরিচয় করিয়ে দেয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রাজীবের সঙ্গে। মেঘু বিজয়ের সঙ্গে পুরনো বিশ্বস্ত কারিগর বিপিনের সাদৃশ্য পায়। মেঘুও বিশ্বাস করেছে বিজয়কে, তার পরিচয় হয় বিনয়ের সঙ্গে। লোকে তাকে আড়ালে বিনচৌ বলে। রাজীব ও বিনচৌ মেঘুকে নতুন করে মেসিনচালিত কারখানা খোলার স্বপ্ন দেখায়। প্রতিশ্রুতি দেয় সাহায্যের। মেঘু বিনয়কে বিশ্বাস ক'রে তার সঞ্চিত অর্থ তাকে দেয়। বিনয় তাকে শহরতলীতে যন্ত্রচালিত বড় কারখানা গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করে; প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাকে দিল্লী থেকে সেন্ট্রাল গর্ভনমেণ্টের পারমিট এনে দেবে। ফলে মেঘু কারখানার জন্য সপ্তাহে ষাটমন ময়দা তুলতে পারবে। মেঘুর মনে সওদাগর হওয়ার সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। তার স্বপ্ন ছিল ইংরেজদের মতো

যন্ত্রচালিত কারখানা গড়ার। মেঘনাদের মনে হয় ধনপতি সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা যেমন দেবীর কৃপায় সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছিল, ধনপতি সওদাগর যেমন বাণিজ্য শুরু করেছিল নতুন করে, সেও সেই সওদাগরের মতোই নতুন করে বাণিজ্য শুরু করতে পারবে। মেঘু বিনয়কে বিশ্বাস ক'রে দিল্লী থেকে পারমিট আনার জন্য তিনহাজার টাকাও দেয়। বিনয় তার সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে প্রতারিত করে তাকে। বিনয় সস্তা দামে ক্রয় করা পুরানো বিস্কুট তৈরি করার ডাইস মেসিন মেঘুর কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। পাঁচশো টাকার জমি বিক্রি করে দশ হাজার টাকায়। মেঘুকে যখন বিনয় প্রতিনিয়ত প্রতারিত করেছে আর তখন তার স্ত্রী লীলা স্বামীর অজ্ঞাতে বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে। নির্জন বাড়িতে একা বিনয়ের সঙ্গে দেখা করেছে। পেশায় বিনয় ছিল অধ্যাপক, যুদ্ধের সময় সে দিল্লী থেকে কলকাতায় চলে আসে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই। এখন সে নীতি ও আদর্শহীন ঠক ও প্রতারক। সে নিরীহ মানুষকে প্রতারিত করে। অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে। বিনয় পুরনো যন্ত্র ও জমির ক্রয় বিক্রয় করে। এছাড়া পাটের ফেঁসোর ঝাড়াই কুঁচো বিদেশে রপ্তানী করে, যা থেকে বিলাতি পশমের কম্বল তৈরি হয়। বিনয় চরিত্রহীন, লম্পট ও দুশ্চরিত্র। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সে একাধিক নারীর সংস্পর্শে এসেছে। দরিদ্র কম্পাউণ্ডার ললিত মজুমদারকে অর্থের লোভ দেখিয়ে তার কন্যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়েছে। অবৈধ সম্পর্ক গড়েছে ডাক্তার সীতানাথের স্ত্রীর সঙ্গে। এখন সে যৌনাকাঙ্ক্ষী মেঘুর স্ত্রী লীলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়তে চায়।

এই উপন্যাসে লীলার ভাই বিজয় চটকলের প্রতিবাদী শ্রমিক। সে স্বাধীন দেশে দিল্লী থেকে কারখানার পারমিট আনার জন্য তিন হাজার টাকা ঘুষ দেওয়াকে সমর্থন করেনি। সে জানত বিনয় চৌধুরী প্রবঞ্চক। তাই বিনয় যখন মেঘুকে ব্যাবসায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, সে তখন সন্দিহান হয়ে উঠে বিনয়ের আচরণে। সে সংগ্রামী শ্রমিক। রাজীবের কাছে জেনেছে স্বাধীন দেশের সে স্বাধীন শ্রমিক। সে প্রতিবাদ করেছে কোম্পানির সস্তা রেশন বন্ধের বিরুদ্ধে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রতিবাদ করেছে সে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী ইউনিয়নের নেতার বিরুদ্ধে। ইউনিয়নের নেতা রাজীব তাকে মালিকের সঙ্গে আপস করার প্রস্তাব দিলে, সে প্রত্যাখান করে ক্ষোভে বলে - ধোকাবাজী, সব ধোকাবাজী।

মেঘনাদ কারিগর ইদ্রিস ও পিতৃ মাতৃহীন ভবঘুরে চালিসের সাহায্যে নতুন কারখানা খুলেছে। নতুন করে সওদাগর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। নতুন কারখানা নিয়ে স্ত্রী লীলার কোন উৎসাহ ও আবেগ নেই।

স্বামীর সওদাগর হওয়ার আশা-উচ্ছ্বাস আনন্দ লীলার রক্তে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাই সে বিনয়ের কাছ থেকে ক্রয় করা স্বামীর দশ হাজার টাকার দলিল অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখান করে। স্বামীর প্রতি তার কোন সহানুভূতি-শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। বোন ঠুমিকে এড়িয়ে সে গোপনে বিনচৌর ঘরে যায়। বিনচৌ লীলার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মেঘুকে প্রতারিত করে তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করতে প্রয়াসী হয়। সে মেঘনাদের কাছে টাকা নিয়ে দিল্লী থেকে নিজের নামে কারখানার পারমিট করে। পুরনো অচল মেশিন মেঘুর কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। শুধু মেঘুকে সর্বস্বান্ত করে সে ক্ষান্ত হয়নি। বিনয় তার স্ত্রী সুলতার চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সে লীলার কাছে অর্থসাহায্য চায়। সে লীলার সঙ্গে কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করে। লীলাকে তার প্রতি আসক্ত ক'রে তোলে। লীলা বিশ্বাস ক'রে স্বামী মেঘুর দেওয়া বহুমূল্যের বাক্সভর্তি সোনার গহনা তুলে দেয় বিনয়ের হাতে। মঙ্গল কাব্যের মা মনসা যেমন চাঁদ সদাগরের পূজা না পেয়ে তাকে ধনে জনে সর্বস্বান্ত করেছিল, তার বাণিজ্য জাহাজ অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল, স্ত্রী লীলাও তেমনি স্বামীর প্রেম ভালোবাসা ও দৈহিক কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বামীকে সর্বস্বান্ত করতে চায়। কিন্তু মেঘু চাঁদের মতোই সংগ্রামশীল। সে ধনপতির মতোই নিঃসঙ্গ হয়েও স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। মঙ্গল কাব্যের উপাদানকে বারে বারে প্রয়োগ করে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু মেঘুর অপরাজেয় সত্তাটিকে চিত্রিত করেছেন এই উপন্যাসে।

মেঘনাদ পুজো দিয়ে কারখানা চালু ক'রে শ্বশুর নকুর সাকে বসিয়েছে গদিতে। বিনয়ের পছন্দের লোক হরিহরকে নিয়োগ করেছে ম্যানেজারের পদে। মেঘু তার পছন্দে কারখানার নাম রেখেছে লীলা বেকারী। বিস্কুটের নাম দিয়েছে ঝুমির ঝুরি। সে পরিশ্রমী, তাই সে কারিগর ইদ্রিস, রাখহরি ও বদনের সঙ্গে তন্দুরের কাজে হাত লাগায়। বিনয়ের নির্দেশে ম্যানেজার হরিহর মেঘুর সহৃদয়তা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কারখানা থেকে ময়দা চুরি করে, পথে বসানোর পরিকল্পনা করে। ঠিক এই সময় মেঘু জানতে পারে বিনয় নিজের নামে কারখানার পারমিট ক'রে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। একদিকে সে প্রতারিত হয়েছে স্ত্রী লীলার কাছে; অন্যদিকে প্রবঞ্চিত হয়েছে বিনয়ের কাছেও। মেঘু আবার প্রতিকূল শক্তির কাছে আপাতভাবে পরাজিত হয়। তাই সে হতাশ হয়ে বিজয়কে বলেছে, সে আজ পরাজিত, ব্যর্থ সওদাগর। কারণ সে চুরি করতে শেখেনি, জোচ্চোরি করতে জানেনা, শয়তানি করতে পারেনি, পারেনি মানুষকে প্রতারিত করতে। সে হীন বিনয়ের অমানবিক ও নির্মম লোভের মধ্যে শ্মশানের শবভুক কুকুরের সাদৃশ্য পায়। সে চেয়েছিল সৎ পথে পরিশ্রম

করে অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু মেঘু সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হয়েও পরাজয় স্বীকার করেনি। সে আবার নিজের হাতে ছোট তন্দুর তৈরি করে। চোরাবাজার থেকে ব্যাগে করে পাঁচ সের ময়দা নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি স্মরণীয় — "মেঘনাদের কণ্ঠোচ্চারিত এই হতাশার সুর শুধু সে যুগের কেন, এ-সময়কারও মধ্যবিত্ত আদর্শচেতা মানুষের জীবনের আশাভঙ্গজনিত ব্যর্থতার সুর। কিন্তু মেঘনাদ তো নিজের কর্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারায়নি, পরাজিত নিষ্ফলতার শূন্যতায় হাহাকার করে বেড়াবার চরিত্রও তার নয়। মেঘনাদের চরিত্রের এই দ্যোতনাটুকু এই উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়।"[৪৪] মেঘনাদ শত প্রতিকূলতার মধ্যে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে সংগ্রাম করেছে। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে পরাজয় স্বীকার করেনি। ঔপন্যাসিকের সংগ্রামী ও অপরাজেয় মানুষের প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তা মেঘনাদ চরিত্রের মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তিজীবনে সমরেশ বসু প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছেন, সম্মুখীন হয়েছেন নানা প্রতিকূলতার। স্ত্রী লীলা স্বেচ্ছায় আসে সর্বহারা স্বামীর ছোট কারখানায়। সে নিজের হাতে বড় কাঠের পাত্রে ময়দা ভেজায়, কারখানার কাজে হাত লাগায়। সমালোচকের এই মত যথার্থ — "জীবনের এক যুদ্ধে পরাজিত মেঘনাদ অপর যুদ্ধে জয়ী হয় সে স্ত্রী লীলার হৃদয়কে লাভ করে।"[৪৫] সর্বস্বান্ত মেঘু দুঃখ ও দুর্দিনে স্ত্রী লীলাকে পাশে পেয়ে খুশি হয়েছে। আনন্দে সে স্ত্রী লীলাকে কারখানার মেশিনের উপর বসায়। মেঘু নিজে বসে মেসিনের নীচে। স্ত্রী লীলা অনুভব করতে পারে সে পেয়েছে স্বামীর পূজা প্রেম ভালোবাসা। লীলা দুহাত বাড়িয়ে দিল তার প্রকাণ্ড রুক্ষ মাথাটায়। মনে হল, এত বড় পুরুষের এমন পুজো সে আর কোন দিন পায়নি। নিমাই বন্দোপাধ্যায়ের মতে — "লীলা মেঘনাদের উপেক্ষার জন্য ক্রোধাগ্নি জ্বলে তার ব্যবসা-বাণিজ্যকে ছারখার করে দিতে চেয়েছিল, যেমন পূজা না পাবার জন্য মনসা করেছিল চাঁদ সদাগরের। পরে নানা ঘটনানুবর্তনে ভয়ঙ্করী লীলা উত্তরণপর্বে শুভঙ্করী লীলায় পরিণত হয়েছে।"[৪৬] উপন্যাসের শেষে মেঘনাদ বলে ঃ "চল সবাই মিলে কাজ করে খাব। চল কাজের সময় হয়েছে।" এই ভাবেই প্রতিকূল শক্তিকে উপেক্ষা করে এক অপরাজেয় ও সংগ্রামী চরিত্র কেমন করে জীবনে স্বপ্নকে জায়মান করতে পারে তাই এই উপন্যাসে দেখালেন জীবনপ্রেমিক শিল্পী সমরেশ বসু। মধ্যযুগের সওদাগর ধনপতি ও সওদাগর চাঁদের যুগপৎ সম্মিলন যেন একালের ব্যাবসায়ী মেঘুর মধ্যে পরিলক্ষিত। একদিকে সে ধনপতির মতোই বিধ্বস্ত হয়ে স্বপ্ন দেখতে ভোলে না, অন্যদিকে সে চাঁদের মতো সর্বস্বান্ত হয়েও সংগ্রামশীল সত্তাটিকে বিসর্জন দেয়না। ❑

৬

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সমরেশ বসুর পূর্বে নদীকে কেন্দ্র করে ও জেলেজীবনকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন মানিক বন্দোপাধ্যায় — ('পদ্মানদীর মাঝি' - ১৯৩৫) ও অদ্বৈত মল্লবর্মন ('তিতাস একটি নদীর নাম' -১৯৫৬)। 'গঙ্গা' উপন্যাসটি কেবল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, সংগ্রামশীল মৎস্যজীবীদের জীবনের ইতিবৃত্তও বটে। 'পদ্মনদীর মাঝি' উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের জীবিকান্বেষণ কিংবা সংগ্রামের থেকে পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব-অতৃপ্তিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের জীবিকান্বেষণ ও জলের লড়াইয়ের থেকেও ঔপন্যাসিকের রোমাণ্টিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত পোষণ করেছেন — "ঔপন্যাসিক অদ্বৈতের অন্তরালে এক স্বপ্নালু কবিমন ক্রিয়াশীল ছিল। যত্রতত্র রোমাণ্টিকতার উতলা বায়ু প্রবেশ করে উপন্যাসের বস্তুকঠিন ভূ-সংস্থানকে শিথিল করে দিয়েছে। তাই তিতাস জেলের সঙ্গে জলের লড়াইয়ের এক অনিবার্য প্রতীক হয়ে দেখা দিতে পারল না।" আর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস পদ্মার উন্মুক্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবিকান্বেষণ বৃত মানুষের সংগ্রামের দিকটাকে গৌণস্থান দিয়া তাদের গতিবিধির ত্বরিত অনিয়মিত ছন্দ ও ঘরোয়া জীবনের ছোটখাট দ্বন্দ্ব-অতৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছে।"[৪৭] 'গঙ্গা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মৎস্যজীবী নিবারণের পুত্র বিলাস। নিবারণ সাইদার অর্থাৎ মাছমারাদের সর্দার বলে পরিচিত। সে শুধু সাইদার নয়, সে গুণিনও। গুণিন যেমন বুঝতে পারে জলের কারসাজি, তেমনি পারে বনের কারসাজি। মৎস্যজীবীরা বেঁচে থাকার তাগিদে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। সাইদার নিবারণের বাবাও সাতানব্বই বছর বয়সে সমুদ্রে গিয়েছিল মাছ ধরতে। নিবারণ ভাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। মাছের মরশুম অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চার মাস তারা মাছ ধরতে সমুদ্রে ভেসে যায়। ঘরে তাদের স্ত্রীরা চিন্তায় রাত্রি জাগে। তাদের স্ত্রীদের দিন কাটে ঘর সংসারের কাজ করে আর রাত কাটে জাল বয়ন করে। কেউ বয়ন করে পাটাজাল, কেউ মেরামত করে ছেঁড়া জাল, কেউবা নতুন জাল গড়ে তোলে। মাছের মরশুমে তাদের স্বামীরা

এই সব জাল নিয়ে মাছ ধরতে সমুদ্রে যাত্রা করে। সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় মৎস্যজীবীদের স্ত্রীদের মহাজনের জালও বয়ন করতে হয়। মৎস্যজীবীদের স্ত্রীদের জীবন যেন মাছ ধরার নিয়মের জালে বাঁধা। প্রতি বছর মালো মৎস্যজীবীদের বেঁচে থাকার তাগিদে সমুদ্রে যাত্রা করতে হয়। এইভাবেই এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু বেঁচে থাকার জন্য দরিদ্র জেলেমাঝিদের দিবারাত্রি সংগ্রামের ইতিবৃত্তটিকে উপস্থাপিত করেন। 'গঙ্গা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু অর্থাৎ মৎস্যজীবী ও তাদের স্ত্রীদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। লেখকের নিজের স্বীকারোক্তি — "আমি যখন আতপুরে থাকতাম তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে যে এলাকাটা ছিল, সেখানে প্রায়ই যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডামারা — এসব করতাম। বর্ষার মরশুমে ওরা মাছ ধরত। এইভাবে ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই হালিশহরে কয়েকটি মৎস্যজীবী পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।"[৪৮] লেখক নিজে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন— "আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাশ, পরেশ দাশ এবং হালি শহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেকদিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে।"[৪৯] লেখক সমরেশ বসু নৈহাটি আতপুরে বসবাসকালে মালো ধীবরদের সংস্পর্শে আসেন এবং গঙ্গার প্রতি তার আকর্ষণও নিবিড় হয়। কিন্তু নদীর প্রতি লেখকের গভীর আকর্ষণ ছিল শৈশব থেকেই।

সাইদার নিবারণ ভাই পাঁচুকে সমুদ্রের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিত। পাঁচুও দাদা নিবারণকে বিশ্বাস করত, ভরসা করত। নিবারণ ও পাঁচু যখন সমুদ্রে যাত্রা করে তখন তাদের স্ত্রীরা ছিল সন্তানসম্ভবা। নিবারণ সাইদার, তাই স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়া সত্ত্বেও তাকে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়। সঙ্গে থাকত ত্রিশ-চল্লিশটি নৌকা এবং পঞ্চাশ-ষাটটি জাল। সমুদ্রযাত্রার পূর্বে পাঁচুর স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করে। নিবারণ স্ত্রীর অপেক্ষায় না থেকে সমুদ্রে যাত্রা করে। মৎস্যজীবীরা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নানা বিশ্বাসে বিচলিত হয়, তারা বিহ্বল হয় অতিপ্রাকৃত, দেবতা-উপদেবতার নানা প্রসঙ্গে। যাত্রাকালে নিবারণ পথে কচ্ছপ দেখেছিল। যাত্রাপথে কচ্ছপ দর্শন অশুভ। মৎস্যজীবীরা বিশ্বাস করে বেরোনোর সময় কাঁকড়া, কচ্ছপ ও কলা দর্শন ভাগ্য বিপর্যয়ের লক্ষণ। সাইদার নিবারণ অশুভ সংকেতকে উপেক্ষা করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। সমুদ্রের অপদেবতা সম্পর্কে সে ভাই পাঁচুকে সদা সতর্ক থাকতে বলত। মৎস্যজীবীদের বিশ্বাস যে, সমুদ্রে নারীবেশে মাছের অপদেবতা ছদ্মবেশে মাছমারাদের কাছে সাহায্য চান। আসলে তাঁরা মানুষ নন। ওঁরা কালান্তক যম। আকারে বিশাল লম্বা

শরীর, গেরুয়া মাটির রং, গায়ে কালো কালো ডোরা দাগ। এরা হলেন মৎস্যজীবীদের প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ রায়। মৎস্যজীবীদের কাছে তাঁরাই বনের রাজা বলে পরিচিত। নানা ছদ্মবেশে এঁরা মৎস্যজীবীদের বিপদের পথে নিয়ে যান। গুণিন নিবারণ শুধু ভাই পাঁচুকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেনি, রক্ষা করেছে অন্যান্য মাছমারাদেরও। কিন্তু নিবারণ নিজেকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সমুদ্রের টানে সমুদ্রে মাছ ধরতে এসে মৃত্যুবরণ করেছে। অপদেবতা দক্ষিণ রায় যমের কাছে নিবারণ পরাজয় স্বীকার করেছে। নিবারণ যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি সাহসী। নিবারণের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে পরাজয় স্বীকার করেনি। এইভাবেই নিবারণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক অপরাজেয় মানুষের সংগ্রামশীল জীবনকে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেন 'গঙ্গা' উপন্যাসে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও নিবারণের মত মৎস্যজীবীরা বেঁচে থাকার সংগ্রামে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। সমালোচক মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গে বলেছেন — "পদ্মানদীর মাঝি কুবের বাড়িতে ফিরে দেখে নবজাতকের মুখ, গঙ্গার মাঝি নিবারণ আর পাঁচু সাগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় তাদের সন্তান জন্মের ক্ষণটিতে, পুরোটা জানাও হয় না কোন্ সন্তানের পিতা হল তারা। কর্ম নয়, আসলে দারিদ্র্য এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, নদী থেকে সাগরে, জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে।"[২০]

অন্তিমকালে নিবারণ ভাই পাঁচুকে সতর্ক করেছিল সমুদ্রে না যেতে। মালোজীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে সাইদার নিবারণের মৃত্যুর পর পাঁচু দাদা নিবারণের পুত্র বিলাসকে নিয়ে গঙ্গায় যাত্রা করে। বিলাস তার বাবা নিবারণের মতো সাহসী ও শক্তিশালী। নিবারণের মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব পড়ে পাঁচু ও বিলাসের উপর। সংগ্রাম শুরু হয় বেঁচে থাকার। বিলাস সকলের কাছে পরিচিত তেঁতলে বিলাস বলে। পাঁচুর নিজস্ব নৌকা নেই। মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে যায় সে। পাঁচুর ঠাকুরদার আমলে তাদের নিজস্ব নৌকা ছিল, ছিল কাছারি জাল, টানাজাল, পাটাজাল সব কিছুই। পাঁচুর বাবার আমল থেকে তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। নিবারণের শুধু নিজস্ব নৌকা ছিল, পাঁচুর আমলে তাও মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছে। বিলাসখুড়ো পাঁচুর সঙ্গে গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়। পাঁচুও দাদা নিবারণের সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে একদা অভিজ্ঞ হয়েছিল। প্রতি বছর মাছমারারা অনেক আশা নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে। কিন্তু মাছ বিক্রির লভ্যাংশের প্রায় সব অর্থ দিয়ে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। মৎস্যজীবীদের সম্মুখীন হতে হয় কখনো প্রকৃতির বিরূপতার কাছে, কখনো ঘাতক মহাজন দালালদের কাছে। এছাড়া অপদেবতা

ও ডাকাত তো আছেই। তাই পাঁচু বলেছে 'চৈত্রমাসে প্রায় প্রতি বছর সন্ন্যাস নিয়েছে। না নিয়েই বা উপায় কী। মাছ মারার ঘরে কয়েক টোটার এক টোটা হল চোত টোটা। অর্থাৎ চৈত্রের মন্বন্তর।' "অভাব নেই কোনওটিরই। মানুষ আর টাকার। সময়ে ওইতেই বড় টান ধরে যায়। মানুষ ফলায় টাকা। দক্ষিণ রায়মশাই ফেরেন ডাঙায় মানুষের খোঁজে আর ওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাপটি মেরে ফেরে আর- একদল। তারা সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে সাইয়ের ওপরে। টাকা আছে যে। বড় শেয়ালের রাজ্যে বিনা খাজনায় মালিকানা করে এরা। তারা সুন্দর বনের ডাকাত।" মহাজনদের শোষণ নীতি 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে পাই। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন — "পৃথিবীর মহাজন-ঘাতকদের চরিত্র সর্বত্র এক ছাঁচেই গড়া। জমির মহাজন, জলের মহাজন ফড়ে-আড়তদার-পাইকের-দালাল-সবারই স্বরূপ এক। পদ্মার কেদারনাথ, তিতাসের মাগন সরকার, আর গঙ্গার ব্রজেন ঠাকুরের মধ্যে তফাৎ সামান্যই, কিন্তু মিল আছে হৃদয়হীন শোষণের তৎপরতায়।"[৫১] মৎস্যজীবী ঠাণ্ডারাম মহাজন পাল মশাইয়ের কাছে ঋণী ছিল। অভাবের তাড়নায় ঠাণ্ডারাম অনাহারে দিন কাটায়। "জোয়ান কোটালের ভারী গোনে, পাক দিয়ে গেছে মরা কোটাল। উত্তরের কলকলানি তলে তলে থাবা বাড়িয়ে গেছে মোহানায়। দরজা বন্ধ করে বসে আছে সমুদ্রের।" ঠাণ্ডারাম পাঁচুকে বলে সে বাড়ি চলে যেতে চায়। গঙ্গা এত বিরূপ হবে আগে জানলে সে মাছ ধরতে আসত না; ক্ষেত মজুরি করত। সে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পালাবার পথ কোথায়! তার পরিবর্তে জেটিতে নৌকা আটকে তার মৃত্যু হয়। গঙ্গায় ঠাণ্ডারামের অসহায় নির্মম মৃত্যুতে নিষ্ঠুর মহাজন পালমশাই বিরক্ত হয়ে বলেছেন — "এরা আসে বা কেন, মরে বা কেন।" শ্রাবণের টোটা খল খল করে বেড়াচ্ছে গঙ্গায়। অনেকে পালিয়েছে। রোজ পালাচ্ছে। যাদের উপায় নেই তারা রয়েছে। পালমশাইও তাদের ধরে রাখতে পারছে না। গঙ্গা যেন মৎস্যজীবীদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় অসহায় মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গে বলেছেন — "শুধু মহাজন নয়, ডাকাতরাও আসে-মহাজনদের মতই। এর সঙ্গে থাকে স্থিতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। জলের সঙ্গে, গহীন স্রোতের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে জেলের জীবন — তবু একফোঁটা জমির মধ্যে কোথায় যেন একটি বাঁধা সুখের ঠিকানা লেখা রয়েছে।"[৫২]

বিলাস প্রতিবাদী। সে মহাজনদের অন্যায়, নির্মম অত্যাচার মেনে নেয় না। পিতা নিবারণের মতো সে একা গঙ্গায় মাছ ধরতে নৌকায় নোঙর তুলে রওনা হয়। পিতা নিবারণের মতো সে কোন

অপদেবতাকে ভয় পায় না, বিশ্বাস করেনা পাঁজিকে। পাঁচু ও বিলাস পাল মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে এসেছে। মহাজনরা মালো ধীবরদের প্রতারিত করে। বিলাস তা মেনে নিতে পারে না। পাঁচু খুড়োর নির্দেশে পাল মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে যায়। মহাজন বিলাসকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়। সে রেগে মহাজনকে ঋণ না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। বিলাসের প্রশ্নে মহাজন চটে যায়। খেকিয়ে উঠে বলেছে, "আমার খুশি"। বিলাস মহাজনকে অপমান করে বলেছে — "তবে আর মরতে মহাজন হওয়া কেন? মাছ হয়ে জন্মালেই হত? মাছ? হ্যাঁ তবে খুশিমত চলা ফেরা করতে পারতে।" মহাজন পালমশাই বিলাসের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পাঁচুকে অভিযোগ করে। পাঁচু বিলাসকে সংযত করার চেষ্টা করে, কটূক্তি ক'রে মারতে উদ্যত হয়। বিলাস যেমন একগুঁয়ে, তেমনি সাহসী। পাঁচু তাকে দমাতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে পাঁচু মহাজনদের স্তাবকতা ক'রে চলে। সে মহাজনদের সঙ্গে বিবাদ চায় না। প্রতিবাদী ও দুঃসাহসী বিলাস চরিত্র প্রসঙ্গে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "বিলাস তার বাবা নিবারণের ছায়া হলেও তার মধ্যে সব সময়ের জন্য একজন প্রতিবাদী মানুষ বাস করে। এখানে সেই চিরাচরিত 'জেনারেশন গ্যাপ' এর কথা বাদ দিয়েও বিলাস একজন আলাদা মানুষ। সোজা কথায় যাকে বলে মুখ ফোঁড় — বিলাস তাই।"[৫৩]

মালো-ধীবররা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গঙ্গায় আসে মাছ ধরতে। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করবে। ভাঙা ঘর মেরামত করবে; মেয়ের বিয়ে দেবে। ধীবররা বারোমাস মহাজনের ঋণে জর্জরিত। ঋণের মাত্রা অধিক হ'লে তাদের জাল, নৌকা এমনকি ভিটে পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়। মাছের মরশুমে তাদের সংসারে সুখ আসে, মুখে ফোটে হাসি। কিন্তু সে সুখ অস্থায়ী, হাসি ক্ষণকালের জন্য। চার মাসের উপার্জনের অর্থ দিয়ে তাদের বারো মাস চলতে হয়। মাছের মরশুমে যে অর্থ উপার্জন করে তা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে শেষ হয়ে যায়। নিত্য অভাব তাদের সংসারে আবার জেঁকে বসে। মালো ধীবররা পাঁজি দেখে মৎস্য শিকারে যাত্রা করে। পাঁজির লেখা না মিললে নিয়তি ও সংস্কারবিশ্বাসী পাঁচু মালো ধীবরদের অনিয়মকে দায়ি করে। বিলাস যুক্তিবাদী সে পাঁজির নিয়মকে মানতে চায় না। পাঁজির লেখা নিয়ে বিলাস সন্দেহ প্রকাশ করে। সে ধীবরদের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে বিশ্বাস করে জলে মাছ না থাকলে শুধু পাঁজিতে লেখা থাকলে কোথা থেকে জালে মাছ উঠবে। পাঁচু পুরানো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে

চায়। মাছমারাদের বদ্ধজীবন থেকে মুক্তি খোঁজার মধ্য দিয়ে বিলাসের নির্ভীক ও সংগ্রামী জীবনটিকে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু।

গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে ধীবরদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। বিলাসের পিতা সাইদার নিবারণকে অর্জুন মাঝি ঈর্ষা করত, চাইত তার আর্থিক ক্ষতি। সে নিবারণের সর্বনাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই সে নিবারণের পুত্র বিলাসের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। সে অন্যায়ভাবে বিলাসের পথ রুদ্ধ করে। বিলাস তার পাল্টা জবাব দেয়। বিলাসের কাছে সে পরাজয় স্বীকার করে। অন্য মাঝিরা বিলাসকে নৈতিকভাবে সমর্থন করে। মহাজন পালমশাই মৎস্যজীবীদের চড়া সুদে ঋণ দেয়। অসহায় মৎস্যজীবীরা মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য। প্রতিবছর তারা সমান মাছ পায় না। অন্যদিকে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে চক্র বৃদ্ধি হারে ঋণ বৃদ্ধি পায়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন তাদের জাল, নৌকা জোর ক'রে আটকে রাখে। ঋণের দায়ে পাঁচুকে তার শেষ সম্বল দাদা নিবারণের পাটাজালটিও মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ধীবররা মহাজনের কাছ থেকে বন্ধক দেওয়া জাল না ছাড়ালে মহাজন তা নিলামে বিক্রি করে দেয়। পাঁচু প্রায় তিন বছর ধরে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। ঋণ পরিশোধ নিয়ে বিলাসের সঙ্গে মহাজনের মতবিরোধ হয়। পাঁচু ভাইপো বিলাসকে সমর্থন করে না। সে মহাজনকে সমর্থন করে। কারণ মহাজন ঋণ না দিলে পাঁচুকে অনাহারে দিন কাটাতে হবে। বিলাস তা মেনে নিতে চায় না। সে যুক্তি দিয়ে বলে মহাজনরা সুদের টাকা দিয়ে জীবন ধারণ করে। বিলাসের যুক্তিকে অন্য মৎস্যজীবীরা সমর্থন করে। মহাজন ঋণের দায়ে জর্জরিত ঠাণ্ডারামকে নৌকা রেখে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। মহাজনরা নানাভাবে মৎস্যজীবীদের প্রতারিত করে, শোষণ করে। তিনশো টাকা ঋণের দায়ে মহাজন সাতশো টাকার নৌকা ও দুই শত টাকার জাল বন্ধক রাখে। শুধু তাই নয়, মহাজনরা ধীবরদের কাছে নিম্নমানের আউসের মোটা চাল বেশি দামে বিক্রি করে। শুধু চাল নয়, তেল, ডাল প্রভৃতির অন্যায্য মূল্য নেয়। মহাজন মালোদের অভাব দারিদ্র্যের যন্ত্রণা অনুভব করতে চায় না। মালো-ধীবরদের তারা বলে "গঙ্গায় বিনা খাজনায় মাছ ধর তবু তোমাদের কিসের অভাব।" প্রতিবাদী বিলাস মহাজনদের অন্যায় যুক্তিকে মানতে চায় না। সে প্রতিবাদ করে বলে — শুধু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে মৎস্যজীবীদের পেট ভরবে না। সমাজের শোষক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার বিলাসকে অঙ্কন করেন একদা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্বে বিশ্বাসী জীবনপ্রেমিক ঔপন্যাসিক। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাজনদের

শোষণনীতি প্রসঙ্গে বলেছেন — "হিংস্র, স্বার্থপর, লোভাতুর, নারী মাংস গন্ধ লোলুপ এই মহাজনেরা চরম অভাবী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষদের সুযোগ পেয়ে জাল-নৌকা আটকে রেখে সুদে কর্জ দিয়ে থাকে। কিন্তু তা আর কোনদিন শোধ হয় না। মহাজনেরা সব সুযোগ বুঝেই ঘাই মারে।"[৪৪] মাছমারাদের জীবন নির্ভর করে মহাজন ফড়েনী পাইকার আড়তদারদের উপর। লেখক দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে অসহায় মৎস্যজীবীদের মহাজনরা ঋণ পরিশোধের বাহানায় কীভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। তা স্পষ্ট হয় পাঁচু ও অনন্তর আলোচনায়। মহাজনকে সন্তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করে মাছমারারা। ঘৃণা সত্ত্বেও হাত জোড় করে মিষ্ট বাক্য বলে — "কেমন আছেন ঠাউরমশাই, বৃত্তান্ত সব ভালোতো। এজ্ঞে আপনাদের দয়ায় বেঁচে আছি।" প্রত্যুত্তরে মহাজন কুৎসিত ইঙ্গিত করে বলে — "তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলব। বউয়ের শরীলে কাপড় চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।"

পাঁচু মহাজনদের অন্যায় অবিচার মাথা পেতে মেনে নেয়। পাঁচুর বিপরীত স্বভাবের ভাইপো বিলাস। সে দাদা নিবারণের সঙ্গে বিলাসের সাদৃশ্য দেখতে পায়। প্রতিবেশী অমর্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অমর্ত্য শারীরিক ভাবে অক্ষম। অমর্ত্যের স্ত্রী বিলাসকে পেতে চায়। সে যেমন কলহপরায়ণ; তেমনি দ্বিচারিনী। বিলাস তাকে বারবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অমর্ত্যের স্ত্রী নাছোড়। বিলাসকে দেখে বাঁকা চোখে বক্র হাসিতে সে কেবল তাকে উত্তক্ত করে। নির্জন বাড়িতে অমর্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসের শারীরিক সম্পর্ক হয়। খুড়ো পাঁচুর সঙ্গে গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে বিলাসের মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি — অমর্ত্যের স্ত্রীর কথা। গভীর রাতে বিলাস গান গায় —

"আমার প্রাণে নাই সুখ - হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।"

পাঁচু ও সয়ারাম বিলাসের অন্যমনস্কতা বুঝতে পারে। বিলাস অমর্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ককে অস্বীকার করে। অমর্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের জন্য সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। সমালোচক বিলাসের আত্মযন্ত্রণা প্রসঙ্গে বলেছেন — "সংসারে বিবেকী মানুষও বিভ্রান্ত হয়ে কখনও কখনও আঘাটায় পা ফেলে। কখনও মজে ঘোলা জলের নেশায়। গ্রামে-গঞ্জে মাছ বিকোতে গিয়ে রক্তের জৈবিক স্বাদ উপেক্ষা করতে পারেনি নিবারণ। চোলাই মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মাতামাতি করে সে ঘরে ফিরে

আসত পাঁচুর বুকে জ্বালা ধরিয়ে। বিলাসও একদিন অমর্ত্যের বউয়ের অসঙ্গত তাড়নায় তাকে নিয়ে ঘোলা জলেই ডুবেছিল। তবে পাঁক ঘাটার কলঙ্ক তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। প্রেমবর্জিত কাম তার কাঙ্ক্ষিত নয়।"[৫৫] অমর্ত্যের বউয়ের সঙ্গে বিলাসের শারীরিক সম্পর্ক-প্রেম নয়, এক দুরন্ত কামনা মাত্র। পাঁচু বিলাসকে তেরো বছরের গামলি পাঁচির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। বিলাস গঙ্গায় মাছ ধরতে এসে গান গায় —

"টানা ছাঁদি টেনে চলি, পাথালি লৌকার বুক - হে
ওই আওড়ের ঘূর্ণি-জলে দেখব তোমার মুখ।।
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।।

সে সমুদ্রে যেতে চায়। পাঁচু শুনে ভয় পায়। অন্তিমকালে মালো নিবারণ ভাই পাঁচুকে সতর্ক করেছিল সমুদ্রে না যেতে। নিবারণের মৃত্যুর পর তাদের বংশে সমুদ্রে যাওয়া নিষেধ। বিলাস কোন বাধা মানতে চায় না। বিলাস গঙ্গায় এসে প্রথম জাল ফেলে। জালে ওঠে ইলিশ মাছ। মাছ বিক্রি নিয়ে পাঁচুর সঙ্গে পাইকারের বচসা হয়। পাঁচু বংশপরম্পরায় দামিনী ফড়েনির কাছে ঋণী। পাঁচুর বাবা ও দাদা নিবারণ ঋণ নিত ফড়েনি দামিনীর কাছে। গড়ে উঠেছিল নিবারণের সঙ্গে দামিনীর ভালোবাসার সম্পর্ক। দামিনী নিবারণের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সমুদ্রের ফড়েনি হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রণয় বাস্তবে পরিণত হয়নি। দামিনীকে মাছ বিক্রি নিয়ে পাইকার রসিকের সঙ্গে পাঁচুর বিরোধ বাঁধে। জোর করে সে পাঁচুর মাছ ক্রয় করতে চায়। বিনা কারণে সে পাঁচুকে অপমান করে। তবু পাঁচু রসিককে সমীহ করে চলে। কেননা সে শহরতলী পশ্চিম পাড়ার মাঝি। এই কারণে রসিককে পাঁচু সসম্মানের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা করে। সে পাঁচুকে অপমান করে। মিথ্যা অভিযোগ করে, বলে পূর্বপাড়ার জেলেরা পালে পালে এসে গঙ্গা দখল করেছে। বিলাস রসিকের আচরণে অপমানবোধ করে। বিলাস উপহাসের সঙ্গে রসিকের কথার প্রত্যুত্তর দেয়। বিলাস বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী। পাঁচু শ্মশানের সাধুদের অন্তর্যামী বলে বিশ্বাস করে। বিলাস সাধুদের কটাক্ষ করে বলে মরা খেগো। সে খুড়োর বিশ্বাসকে আঘাত করে। পাঁচু তা মেনে নিতে চায় না। এইভাবেই ধীবরের মধ্যে বিলাস ব্যতিক্রম হিসাবেই চিহ্নিত, ধীবরদের জালবদ্ধ জীবনে বিলাস হয়ে ওঠে অভিনব আগন্তুক।

দামিনী ফড়েনি পাঁচুকে সম্মান করে, বিশ্বাস করে। দামিনীর নাতনি হিমি এখন নিজের হাতে ব্যাবসা দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে। পাঁচু ও বিলাসের সঙ্গে তার নতুন করে পরিচয় হয়। বিলাস ফড়ে

বা পাইকারদের সঙ্গে শুধু ব্যাবসার সম্পর্ক রাখতে চায়। পাঁচুর সঙ্গে দামিনীর অনেকদিনের সম্পর্ক। তারা উভয়ে পরস্পরের পারিবারিক কুশল সংবাদ নেয়। এতে বিলাস খুড়ো পাঁচুর উপর রেগে যায়। বিলাসের কাছে মহাজন, পাইকার, ফড়ে এরা সকলেই একশ্রেণির। এদের ধর্ম জেলেদের প্রতারিত করা, শোষণ করা। দামিনী ও হিমি অন্যান্য ফড়েদের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। দামিনী অভাবের দিনে পাঁচুকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মাঝি রসিক দামিনীকে বিলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বিলাস যদি সংযত না হয় তবে সে তার জিব টেনে ছিঁড়ে দেবে। বিলাস ও রসিকের উপর হিংস্র বাঘের মতো ক্ষুব্ধ হয়। রসিক মাছমারা হ'লেও নানা অবৈধ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত। সে নারী পাচারের দালালি করে। দামিনী বিলাসের মধ্যে নিবারণের সাদৃশ্য লক্ষ করে। হিমি মাছ মারাদের ঠকাতে চায় না। দামিনী পাঁচুকে ইলিশ মাছের দাম কম দিলে, সে বাধা দেয়। হিমি ন্যায্য মূল্যে মাছ ক্রয় করে। প্রতারক পাইকারদের সঙ্গে হিমির মতবিরোধ ঘটে। মহাজন পালমশাইয়ের কাছে ধীবর সয়ারাম ও ঠাণ্ডারাম ঋণী। অধিক ঋণের দায়ে তাদের নৌকা মহাজনের কাছে আটকে রয়েছে। সয়ারামকে মহাজনের কাছে নিজের নৌকা ভাড়া নিতে হয়। মৎস্যজীবীদের একদিকে শোষণ করে মহাজন, অপরদিকে আক্রমণ করে মাছের অপদেবতা দানো। দানোকে মন্ত্রে বশীভূত করতে পারে একমাত্র গুনিন। দানো ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সময় রেগে গঙ্গার দুপাশের গাছপালা ভেঙে চুরমার করে যায়। বনকর্মীরা সন্দেহ করে জেলেদের। তল্লাসী করে তাদের নৌকা। কখনো অপদেবতা দানোর আক্রমণে মাছমারাদের প্রাণ ও হারাতে হয়। ধীবরদের স্বাধীনতা নেই, নেই ইচ্ছামতে নগদ মূল্যে মাছ বিক্রির অধিকার। কেদুমে পাঁচু নগদ মূল্যে পাইকার আতড়কে মাছ বিক্রি করার জন্য মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের কাছে অপমানিত হয়। তাকে শুনতে হয় অশ্লীল গালাগাল। কেদুমে পাঁচু মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের কাছে ঋণগ্রস্ত। সে মহাজনের কাছে ভুল স্বীকার করে, হাত জোড় করে ক্ষমা চায়। তবু মহাজন তাকে ক্ষমা করতে চায় না। প্রতিবাদী বিলাস মহাজন ব্রজেনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে মহাজনকে স্পষ্টভাবে বলে, অন্যায় করেছে যে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। জাত তুলে অপমান করার অধিকার নেই তার। মহাজন বিলাসকে শাসিয়ে যায়। কিন্তু মহাজনকে সে ভয় পায় না। বিলাসের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন। অপরাধের বিনিময়ে শাস্তি পেতে রাজি তবু মাথা নত করে সম্মান খোয়াতে চায় না সে।

বিলাস ধীবরদের বিপদের পাশে এসে দাঁড়ায়। মহাজনি নৌকা অন্যায়ভাবে কেদুমে পাঁচুর খুঁটে জাল-ছিঁড়ে দেয়। বিলাস মাঝিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পাল্টা আঘাত করেছে মহাজনি নৌকার মাঝিদের। গভীর রাতে সে তাদের নৌকার তলার কাঠ খুলে দেয়। ভোররাতে তাদের নৌকা তলিয়ে যায় গভীর জলে। বিলাসের প্রতিবাদমূলক আচরণে পাঁচু ভয় পায়। দামিনী বিলাসের মধ্যে দেখতে পায় নিবারণের দুঃসাহসিক সত্তাটিকে। আবার যে বিলাস মহাজনি নৌকার মাঝিদের শাস্তি দিতে পারে হিমি ভালোবাসে তাকে। বিলাসও ভালোবাসে হিমিকে। হিমি বিলাসকে 'ঢপ' বলে ডাকে বিলাস হিমিকে বলে 'মহারাণি'। হিমি ও দামিনীর সঙ্গে খুড়ো পাঁচুর ভাব দেখে এক সময় বিলাস বিরক্ত হয়ে বলেছিল, মাছ বিক্রি করতে এসেছো না আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়তে এসেছো। সেদিন বিলাসের অভদ্র আচরণে পাঁচু লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু আজ পাঁচু চায় না বিলাস হিমিকে নববধূ করে ঘরে নিয়ে আসুক। বিলাসের মতো হিমিরও জীবনের কলঙ্ক আছে। হিমি যুবতি, তবু সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তার রূপ ও যৌবনে মুগ্ধ একাধিক পুরুষ। গত এক বছর চুঁচুড়ায় এক জনের ঘরে কাটিয়েছে। সে নাকি তার মনের মানুষ। সেখানেও তার মন রইলনা। ফিরে এসেছে দিদিমা দামিনীর কাছে। হিমির মনে পুরুষের ভালোবাসার প্রতি অনীহা ও অশ্রদ্ধা জন্মেছিল। সেই হিমি দুঃসাহসী বিলাসের রূপে ও গুণে মুগ্ধ। পেতে চায় বিলাসকে জীবনসঙ্গী হিসাবে। বিলাস স্বপ্ন দেখে সে সমুদ্রে যাবে। বড় সাইদার হ'বে। সে নৌকা বইতে বইতে গান গায় —

"আমার ভরা জোয়ার গেল, ভাটার বেলা এলহে,
আর আমি বহীতে নারী ঘরে হে।"

সমুদ্রের যাওয়ার গান শুনে পাঁচু ভয় পায়। হিমি স্বপ্ন দেখে সে বিলাসের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সমুদ্রের ফড়েনি হবে। পাঁচুর মনে সংশয় ও ভীতির সঞ্চার হয়। পূর্ব মালো-ধীবরের সঙ্গে পশ্চিমের শহরতলীর ফড়েনির দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের হয় না। দামিনীও তাদের প্রেমকে সমর্থন করে না। অথচ এই দামিনী জীবনে স্বপ্ন দেখেছিল। সমুদ্রের ফরেনি হবে। নিবারণের জীবনসঙ্গিনী হবে। সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তথা এক সংগ্রামশীল জীবনের আহ্বানকে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছে বিলাস। মাছমারাদের জীবনের আতঙ্ক তাকে গ্রাস করেনি।

গঙ্গায় মাছ না পেয়ে ধীবররা হতাশ হয়ে পড়ে। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরি, চুনুরি প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে গঙ্গায় মাছ ধরতে। এছাড়া রাজবংশীরাও কালে কালে ভূমিহীন হয়ে

মৎস্যজীবীতে পরিণত হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিরুপায় ও অসহায়, অভাব ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। গঙ্গায় মাছ না পেলে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারেনা। অথবা অন্য পেশায় যাওয়ার স্বাধীনতা বা অধিকারও তাদের নেই। মহাজনরা শুধু অর্থ সঞ্চয়ের কথা ভাবে। ঋণগ্রস্ত ঠাণ্ডারামের মতো অন্য মাঝিরা মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। মহাজনরা বড় নির্মম। ঠাণ্ডারামের মৃত্যুতে নেই দুঃখ, নেই অনুশোচনা। পৃথিবীতে কে এলো, কে গেল - এ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তা জেলে মাঝিরা তাদের অল্পবুদ্ধিতে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না। ঠাণ্ডারামের মৃত্যুর সংবাদে পাঁচু হারিয়ে ফেলে শারীরিক সক্ষমতা। অন্যদিকে মাছের অভাবে সঞ্চিত অর্থ প্রায় শেষ হয়ে আসে। শ্রাবণের টোটায় ধীবররা গঙ্গা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। শ্রাবণের টোটায় বিলাস আবার পশ্চিমপাড়ার ধীবরদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমপাড়ার ধীবররা পূর্বপাড়ার ধীবরদের বঞ্চিত করে। অন্যায়ভাবে গঙ্গায় বাঁধা ছাদি জাল ফেলে। পূর্বের ধীবরদের মাছের অভাবে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। তারা দূরদেশ থেকে গঙ্গায় মাছ ধরতে এসেছে। তাই সঙ্গে বাধা ছাদিজাল আনতে পারে না। বিলাস পূর্বপাড়ার ধীবরদের হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে জোর করে তাদের বাধা ছাদিজাল খুলে দেয়। পাঁচু চায় না বিলাস নতুন করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ুক। সে বিলাসকে বার বার সাবধান করে বলে আপোসে বিবাদ মেটাতে। বিলাসের যুক্তিকে সকলে সমর্থন করে। জয় হয় বিলাসের। এই ভাবেই, যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে পারঙ্গম এক সংগ্রামী জীবনকে বিলাসের মধ্য দিয়েই উপস্থাপন করেন ঔপন্যাসিক।

গঙ্গায় পাঁচুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে ভাইপো বিলাসকে ফড়েনি হিমিকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে যায়। বলেছে "দামিনীর নাতিনের প্রাণ খানি নিষ্পাপ বলে বুইছি। ছুঁড়ি তোকে ভালোবাসে। মানুষের জীবনে এমন হয়। দামিনী চেয়েছিল তোর বাবারে, পায়নি। লাতিন পেয়েছে তোকে। মাছ মারার ঘরে যদি মেয়েটা আসতে চায়, তবে নিয়।' এই সঙ্গে পাঁচু বিলাসকে হালে বসার অনুমতি দেয় এবং সমুদ্রে যাওয়ার ছাড়পত্রও দিয়ে যায়। খুড়ো পাঁচুর মৃত্যুর পর বিলাসের জালে প্রচুর ইলিশ মাছ ওঠে। মাছ পেয়ে সে খুশি, কিন্তু খুড়োর জন্য মনটা কেমন বিষন্ন হয়ে পড়ে। হিমি নানা রংয়ের শাড়ি পরে, কখনো পরে ইলিশের লাল রক্ত বর্ণের, আবার কখনো পরে নীলাম্বরী শাড়ি। সে বিলাসকে ঘরে আসার প্রস্তাব দেয়। বিলাসের সঙ্গে সে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। বিলাস ও হিমি তাদের অতীত জীবনের কলঙ্ক ভুলে নবজীবন শুরু করতে চায়।

সমুদ্রের গঙ্গা পূজায় বিলাস অংশ গ্রহণ করে। মনে পড়ে বিলাসের খুড়োর কথা, খুড়ি ও মার কথা। তার মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা 'মহারাণী' (হিমি)কে নববধূ করে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। হিমিকে ছাড়তে দামিনীর মন চায় না। তার মনে নাতনি হিমির সুখ নিয়ে সংশয় জাগে। হিমি দিদিমা দামিনীর সংশয় উপেক্ষা করে লাল রংয়ের শাড়ি পরে বিলাসের নৌকায় চেপে সমুদ্রে যাত্রা করে। হিমি তার সঞ্চিত অর্থ ও সোনার অলঙ্কার বিলাসের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু মাঝ পথে হিমি নেমে পড়ে। সে বিলাসের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে, যদিও সে বিলাসের ভালোবাসাকে অস্বীকার করে নি। "নীলাম্বরি বিশাল বিলাসের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল হিমি, ওগো ঢপ, আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে। বিলাসের পায়ে মাথাঠুকে বলল হিমি, 'সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন- চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে; আঁধার রাত্রে আমার প্রাণ পুড়বে। তোমার নাগাল তো আমি পাব না।' " এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন — "বিলাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হিমির জীবনে বর্ষা এলো, শুধু অকূল পাথারে ভাসবার অপেক্ষায়। ভেসেছিলও সে বিলাসের দুর্বার আকর্ষণে, কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। 'হিমির স্বভাগত সঙ্কোচ আত্মকেন্দ্রিকতা শেষ পর্যন্ত তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল।"[৫৬] বিলাসও হিমির ভালোবাসাকে অস্বীকার করেনি। সে সমুদ্রের টানে সমুদ্রে যাত্রা করে। বিলাস সমুদ্রের যাত্রী। সে নিজেকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না। হিমি তার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলে বিলাস শান্ত ভাবেই বলে, আমি মাছমারা মহারানি, অকূলে আমার জীবন, অকূলে আমার মরণ। বিলাস প্রেম ভালোবাসা ও প্রিয়জনের মায়ামমতা অতিক্রম করে সমুদ্রে যাত্রা করে। কোন বন্ধনই তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। বিলাস জীবনের প্রেম ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেনি, সে স্বীকার করেছে হিমির ভালোবাসা তাকে সমুদ্রে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। হিমি বিলাসকে গঙ্গায় থাকতে অনুরোধ করলে, সে হিমিকে বলে — 'পারলে তোমাকে কে ছাড়তে পারে। তবে মহারানি, মনে দুঃখু রেখো না; কেনা না, এইটি সত্য বলে ঠাহর পেলুম, তুমি আমাকে অনেক দিলে। তোমাকে ছেড়ে যাবার সাহসও দিলে।' হিমির প্রতি বিলাসের ভালোবাসার গভীরতা সম্পর্কে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "মানুষকে ভালোবাসি বলে চিৎকার না করেও ভালোবাসা যায়। এ ভালোবাসা সর্বগ্রাসী, বহুব্যাপী — অনেকটাই বিলাসের সমুদ্র প্রেমের মতন, সহসা উপন্যাসে জল, মাছ আর মানুষ একাকার করে দেওয়া ভালোবাসার মতন।"[৫৭] সমালোচক প্রসূন ঘোষের অভিমত — "অমর্ত্যর স্ত্রীর আহ্বানকে একদিন সে প্রত্যাখান করতে

পারেনি, সেই শরীরী মিলনই এই গ্লানির উৎস। কিন্তু হিমির আকর্ষণ যেন ভিন্নস্বাদী, সমুদ্রের মতোই তার টান, বিলাসকে স্বতন্ত্র এক জগতের সন্ধান দিতে পারে।"[৫৮]

ব্যক্তিজীবনে সমরেশ বসু প্রথাগত জীবনকে বার বার অতিক্রম করেছেন। সমরেশ বসু নানা নারীর সান্নিধ্যে এসেছেন। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা তার শিল্পী জীবনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। নারীর প্রেম বিলাসকে অজানা অনিশ্চিত জীবনের অংশীদার হতে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে। যৌবনের দাবি বিলাসকে হিমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করেছে। কিন্তু হিমি বিলাসকে দূর সমুদ্রের পাড়ি দেওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। সমরেশের শিল্পী সত্তায় যেমন এক ছন্নছাড়া চাঞ্চল্য ছিল, বিলাসের ক্ষেত্রেও যেন সেই অস্থিরতাই বিরাজিত।

সমরেশের ব্যক্তি জীবনের মধ্যে এই বেপরোয়া বোহেমিয়ান স্বভাব ছিল। তাই স্রষ্টা সমরেশের মতোই কোন নারী বিলাসের জীবনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি; বিলাসের একমাত্র প্রেম যেন সমুদ্রের সঙ্গে। সংগ্রাম যেন তার জীবনের একমাত্র হাতিয়ার। ❑

৭

সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপন্নতার চিত্র তুলে ধরেছেন। সমরেশ বসুর পূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে গ্রামীণ সংস্কৃতির চিত্র, পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার নানা প্রসঙ্গ, যান্ত্রিক যুগের সূচনার ইঙ্গিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রসঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। সমরেশ বসুর এই উপন্যাসে অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, অশিক্ষা অন্ধ কুসংস্কার সবই রয়েছে। কিন্তু লেখক সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মতো অনুরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। নিমাই বন্দোপাধ্যায় 'বাঘিনী' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন — "ক্ষয়ে-যাওয়া পচনশীল মুমূর্ষু গ্রামীণ সমাজের বাস্তব লিপিচিত্র সুদক্ষ শিল্পীর মতো সমরেশ অঙ্কন করেছেন এই উপন্যাসে। গ্রামীণ অর্থনীতির বনিয়াদ ভাঙার পাশাপাশি সমাজ-জীবনের যে এক ধরনের আত্মনির্ভরশীল সংহতি ছিল তা নড়বড়ে

হয়ে গেল।"[৫৯] লেখক সমরেশ বসু এই উপন্যাসের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন — " এ উপন্যাস এমন একটি দর্পণ, যে ধাতু আমিই তরল করেছি, ছাঁচে ঢেলেছি। তবু যদি কেউ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন সেটা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। তার জন্য এ দর্পণের কোনো দোষ নেই।"[৬০] এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিরঞ্জীব ও পারুলবালা ওরফে দুর্গা। চিরঞ্জীব শিক্ষিত ও সুনামধন্য ভদ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তান। দুর্গা প্রায় নিরক্ষর, অখ্যাত বাগদি পরিবারের বাঁকা বাগদির মেয়ে। মা মারা যাওয়ার পর দুর্গা প্রায় নিঃসঙ্গ। প্রিয়জন বলতে বাবা বাঁকা বাগদি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ছিলনা। একদা বাঁকা বাগদি জমিদারের শোষণনীতির ফলে অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় নিজের শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বিক্রি করে কারখানায় কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছে। কারখানায় যন্ত্রচালিত মেশিন আমদানির ফলে সেখানেও সে কর্মহীন হয়ে পড়ে। কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে বাঁকা মজুরের কাজ করেছে। কিন্তু সে নিয়মিত কাজ পেত না। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বাঁকা ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে অবৈধ ও অসৎ পথে চোলাই মদের ব্যাবসার জীবিকা গ্রহণ করেছে। সে জীবনে প্রথম সংগ্রাম শুরু করেছিল পরিশ্রমের দ্বারা সৎ পথে উপার্জনের। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়েছে সে। বেঁচে থাকার তাগিদে অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। বাঁকা বাগ্‌দির নিজের মূলধন ছিল না। অবৈধ চোলাই মদের মহাজন অক্রূরদের অধীনে সে কাজ করত। বাঁকার সংসারে ছিল নিত্য অভাব। অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে হত তাদের। বাঁকা সমাজে দুর্ধর্ষ চোরাচালানকারী হিসাবে পরিচিত হয়। পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে ধরতে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে। বাবা (বাঁকা বাগ্‌দি)র মৃত্যুর পর দুর্গা পৃথিবীতে নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হয়েছে। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সাময়িক ভাবে। বাবাকে হারিয়ে দুর্গা সর্বহারা হয়েছে। বাঁকার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শুধু সে-ই কেঁদেছিল। মৃত বাঁকা বাগদির জন্য শোক প্রকাশ করা বা দুঃখ প্রকাশ করা নীতি বিরুদ্ধ ও অসম্মানকর ছিল সমাজে। কারণ বাঁকা বাগদি ছিল ঘোর পাপী। শ্মশানে এসেছিল মহাজন অক্রূর দে, বাঁকার শাক্‌বেদ ভোলা-কেষ্ট সহ আবগারির পুলিশ অফিসার সুরেশবাবু। সুরেশবাবু জীবিত অবস্থায় বাঁকাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণের জন্য সেও শ্মশানে এসেছে। পিতৃহারা শোকের মাঝে দুর্গা লক্ষ করেছে, তার অষ্টাদশী বয়সের যৌবনের দিকে পুরুষের লালসার দৃষ্টি। দুর্গা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যেও পুরুষের লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, পরাজয় স্বীকার করেনি সমাজের কাছে। বাবার মৃত্যুশোক ও স্মৃতি ভুলে স্বনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করেছে। সমালোচক বলেছেন — "বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ে হওয়ার জন্য লুব্ধ পুরুষের লালসা পিছিল

বাহু যে তার দিকে ধাবিত হবে তা লেখকের প্রাগুক্ত তির্যক ভাষাবন্ধের মধ্য দিয়ে, যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়ে গেছে, এটা বোঝা হয়ে গেছে যে দুর্গা সহজে আত্মসমর্পন করার মেয়ে নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের ভীরু কুণ্ঠিত মেয়ে সে নয়।"[৬১] বাবা বাঁকার মৃত্যুর পর দুর্গার জীবিকা নির্বাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কখনো সে প্রতিবেশী যমুনামাসির কাছে অর্থ সাহায্য নিয়েছে, কখনো অনাহারে দিন কাটিয়েছে। কেউ তাকে আদর্শ কর্মের পথ দেখায়নি। বেঁচে থাকার জন্য তার একটি মাত্র পথ খোলা ছিল — তা হল দেহব্যাবসা। কিন্তু সে এই পথে পা বাড়ায় নি। দুর্গা সাহসী, প্রতিবাদী, ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শৈশব থেকেই সে তেজি, মুখরা ও দাম্ভিক। প্রতিকূল সমাজে দুর্গা পশুবৃত্তিসম্পন্ন হিংস্র কামনার অধিকারী লোলুপ মানুষদের হাত থেকে সাহসিকতার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ভীরু মেয়ে সে নয়। দুর্গার সমবয়সী অনেক মেয়ে বাবা মা স্বামীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে সমাজনিষিদ্ধা হতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গা মহাজন অক্রূরদের স্বেচ্ছায় দিতে চাওয়া অর্থ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছে, প্রতিরোধ করেছে শাক্‌রেদ ভোলা ও কেষ্টর কামনা ও লালসার দৃষ্টিকে। "দুর্গা দরজা বন্ধ না করেই ঘরে ঢুকেছিল। বেবিয়ে যখন এসেছিল, হাতে ছিল তখন বাঁকা বাগ্‌দীর সেই আঁশ-কাটা সড়কি। সড়কির চেয়েও বেশি ধার ছিল দুর্গার চোখে। অন্ধকারেও চাপা ছিল না সেই চোখের আগুন।" প্রতিবেশী মাতি মুচিনী ও গানি দুর্গাকে দেহব্যাবসা করে অর্থ উপার্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সে প্রস্তাব দুর্গা প্রত্যাখান করিছে। দুর্গা প্রতিবাদী। সে অন্যায়কে সমর্থন করে না। চারবছর পূর্বে সে কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। জোতদার জমিদারের শোষণনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলও খেটেছে। বাবার দেওয়া নগিনের মেজো ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দুর্গা ঘৃণা ও উপহাসের সঙ্গে প্রত্যাখান করেছে। কারণ নগিনের ছেলে অর্থলোভী আর দুর্গা পণপ্রথার বিরোধী। সে সারা জীবন অনূঢ়া থাকতে প্রস্তুত তবু পণ দিয়ে বিয়ে করতে রাজি নয়। তিন বছর পূর্বে প্রতিবেশী লম্পট কদমা দুর্গার সরলতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার শ্লীনতাহানি করেছিল। সে আজও তা ভুলতে পারেনি। সে কদমার অসৎ আচরণের প্রতিশোধ নিতে চায়। দুর্গার আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। নিজের চরিত্র সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। বাবা বাঁকা জীবিত কালে তার সঙ্গে দুর্গার নিত্য ঝগড়া হত — সংসারের অভাব অনাটন নিয়ে। বাঁকা বাগ্‌দি বেশিরভাগ রাতে বাড়িতে ফিরত না। কিন্তু তবু দুর্গা প্রতিবেশী পাড়ার মাসি-পিসি, বকুলফুল বা গঙ্গাজলদের সাহায্য নিত না। রাতে সে একা বাড়িতে শুত। তার ধারণা ছিল তারা তার মনে কুমন্ত্রণা দেবে। আত্মমর্যাদা

সম্পর্কে সে সদা সচেতন। সমালোচকের মতে — "বাবার চিতায় আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন অনেক লোকের ভিড় হয়েছিল শ্মশানে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের চোখ লেহন করছিল দুর্গার শরীর। শোকের মধ্যেও সে এটা ঠিক লক্ষ করেছিল, আর মনে মনে কুৎসিত লোলুপ মানুষের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছিল।"[৬২] নিরাশ্রয় ও একাকী দুর্গাকে সকলে নষ্ট করতে চায়। কিন্তু সে সমাজে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কোথাও সে এতটুকু আশ্রয় বা অবলম্বন পায়নি।

দুর্গা বাবার অবৈধ চোলাই মদের ব্যাবসাকে সমর্থন করত না। বাবার মৃত্যুর পর চোলাই মদের ব্যাবসাকে সে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়নি। দুর্গা অভাব ও অনাহারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বাবার অবৈধ পেশাকে জীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে। চিরঞ্জীবের প্রস্তাবে রাজি হয়ে চোলাই মদের ব্যাবসা শুরু করে। দুর্গা চিরঞ্জীবের দলের ছেলে গুলিকে বলেছিল 'চিরো ঠাকুরকে বলিস, আমি গুড় আর মশলা চেয়েছি তার কাছে। কয়লাও যেন পাঠায় পরিমাণ বুঝে।' দেহব্যাবসা ক'রে জীবনধারণের চেয়ে চোলাই মদের ব্যাবসা দুর্গার কাছে সম্মানের ছিল। চিরঞ্জীব ব্যানার্জী উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। ছাত্রজীবন থেকে সে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নায়ক চিরঞ্জীব দুর্দান্ত দুর্বিনীত দুর্জয়। বামপন্থী বিধায়ক শ্রীধরদাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে সে। বিমলাপুরের কৃষকদের উপর পুলিশের অন্যায়ভাবে নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদ করেছে। জোতদার-জমিদারের শোষণনীতির ফলে সাধারণ কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। জমিদারের শোষণনীতি ও পুলিশের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষকদের মাঝে আন্দোলনের জোয়ার বয়ে এনেছে। আন্দোলন করে সে জেলও খেটেছে। তবু সে জমিদারের কাছে মাথা নত করেনি। কৃষক সমিতির কাজে সে ঘুরেছে গ্রামে গ্রামে। তার পরিবারের সকলে যখন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল, তখন চিরঞ্জীব গ্রামে-গ্রামে দরিদ্র কৃষকদের খাদ্য বিতরণ করেছে। অথচ নিজের পরিবারে খাদ্যের চরম সংকট। কখনো সে নিজের পরিবারের জন্য ভাবেনি। বাবা মৃত্যুপথযাত্রী, মা অসচ্ছল সংসারের নির্বাক দর্শক। শেষ সম্বল ছিল সামান্য চাষের জমি। সে জমিও ভাগে চাষ হত না। চিরঞ্জীবের মা তাকে কৃষক সমিতি ছেড়ে চাকরির সন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল। সে মায়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। সে কৃষক সমিতি তথা বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। সংসারের চরম আর্থিক অভাব অনটনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। ব্যক্তিজীবনে লেখক সমরেশ বসু তরুণ বয়সে বামপন্থী মার্কসবাদী

পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। সত্যভূষণ মজুমদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমরেশ মার্কসবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল ১৯৪৯ সালে কারাবরণও করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছেন সংসারের চরম দারিদ্র্য ও অভাব। সপ্তাহে প্রায় অধিকাংশ দিন সত্য মাষ্টারের সাহায্যে সংসারে অন্ন জুটত। তবু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। চাকরি থেকে ইস্তফা দেন অথচ পার্টি করবেন না এই মুচলেখা দেননি। উপন্যাসের নায়ক চিরঞ্জীবও রাজনৈতিক দীক্ষা নিয়েছিল বামপন্থী কৃষক নেতা শ্রীধর দাসের কাছে। কৃষক সমিতিৰ সে সদস্য। গ্রামে-গ্রামে সে কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়। দরিদ্র, নিরক্ষর, ভূমিহীন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে সে।

চিরঞ্জীব প্রত্যক্ষ করেছে সংসারের নিত্য অভাব-অনটন। চিরঞ্জীবের দিদি কমলার সঙ্গে কৃষক নেতা শ্রীধর দাসের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রখর। নীচু জাতের শ্রীধর দাস রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিস্বার্থে উঁচু জাতের কমলাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। অর্থশালী অশ্বিনীবাবু ও রামনাথ অর্থের লোভ দিয়ে প্রতারিত করেছে তার দিদি কমলাকে। কমলা রামনাথকে বিশ্বাস ক'রে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। কমলা তাকে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছিল। অথচ অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর রামনাথ তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কুমারী অন্তঃসত্ত্বা কমলা সমাজের চোখে কলঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়েছে। প্রথমে হয়েছে রক্ষিতা, পরে হয়েছে দেহব্যবসায়ী। চিরঞ্জীব রামনাথের অন্যায় ও অবিচারকে মেনে নিতে পারে নি। সে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অভিযোগ করতে চেয়েছিল কৃষক নেতা শ্রীধর দাসের কাছে। কিন্তু দিদি (কমলা) স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়ার পর চিরঞ্জীব অপমানে দুঃখে হতাশ ও নিরাশ হয়ে নীরবে গৃহত্যাগ করে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরেছে শহরের নানা স্থানে। সমাজের শিক্ষিত অর্থশালী ভদ্রসমাজের প্রতি তার জন্মে ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস। সে স্থির করে আর সে কৃষক সমিতি করবে না। অনাহারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চিরঞ্জীব অবৈধ চোলাই মদের ব্যাবসাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। জটার সঙ্গী হয়ে শুরু করে চোলাই মদের ব্যাবসা। সে চোলাই মদ সাইকেলের টিউবে ভর্তি করে চটকলের বস্তি অঞ্চলে মাতাল জুয়াড়িদের কাছে বিক্রয় করে। অল্পদিনের মধ্যে সে আবগারি পুলিশ বিভাগের কাছে ইল্লিসিট লিকারের কুখ্যাত স্মাগলারে পরিচিত হয়। নায়ক চিরঞ্জীব একদা উচ্চবংশের শিক্ষিত যুবক, রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও কঠোর বাস্তবতা তাকে বিপথে চালিত করেছে। রাজনীতির সূত্রে সমাজে কৃষক আন্দোলনের অভ্যুত্থান

ঘটলেও ব্যক্তিজীবনে সে সংসারের অভাব দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমালোচক ঝুমা রায় চৌধুরীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য — "পঞ্চাশ ষাটের দশকে বাঙালি যুবক মাত্রেই বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ ছিল অধিক। যেমন সমরেশ নিজেও তরুণ বয়সে পার্টির সদস্য ছিলেন। শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে বাম দলগুলিতে। রাজনৈতিক আদর্শে শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে তারা। আবার এই শিক্ষিত অথচ দরিদ্র কমরেডরাই হয়ে ওঠে পার্টির জঙ্গি নেতা।"[৬৩] চিরঞ্জীব ওরফে চিরো চোলাইমদ পাচার করতে গিয়ে আবগারি জমাদার কাসেমের হাত থেকে রক্ষা পেতে দুর্গার ঘরে আশ্রয় নেয়। দুর্গা নিরক্ষর হ'লেও বুদ্ধিমতি। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সুকৌশলে জমাদারের হাত থেকে চিরোকে রক্ষা করেছে। চিরঞ্জীব দুর্গাকে চোলাই মদের ব্যাবসার সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দেয়। অনাথ, নিঃসঙ্গ ও অসহায় দুর্গা কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ না পেয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হয়। চিরো ও দুর্গা অবৈধ পথে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দননগর ও কলকাতায় চোলাই মদ পাচার করে। পুলিশ অফিসার সুরেশবাবু তাদের ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। পরাজয় স্বীকার করেছে চিরো ও দুর্গার কাছে। সমালোচক নিমাই বন্দোপাধ্যায় উপন্যাসের নায়ক চিরঞ্জীব প্রসঙ্গে বলেছেন — "বাঙালী-যুবকেরা চিরকালই রাজনীতি - সচেতন, বামপন্থী মার্গেই তাদের বেশি বিচরণ। আর শিক্ষিত বেকার হলে তাদের জঙ্গী মনোভাব আরও শাণিত হয়ে ওঠে। একটা স্থির রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। নিজের ও পরিবারের কথা না ভেবে দেশের স্বার্থে চঞ্চল কর্মতরঙ্গে তারা ঝাপিয়ে পড়ে।"[৬৪]

সমাজের বে-আইনি চোলাই মদের ব্যাবসা প্রতিরোধের জন্য পুলিশ অফিসার সুরেশবাবুর স্থানে আসেন বলাই সান্যাল। দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবে বলাইবাবুর খ্যাতি ছিল। তরাইয়ের বাঘ বলে তিনি পরিচিত। পূর্বে তিনি একাধিক বার চোরাই মাদক দ্রব্য পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করে সাহসিকতার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি শিলিগুড়িতে গাঁজা পাচারকারী এক সুন্দরী যুবতীকে গ্রেপ্তার করেছেন। সুরেশবাবু দুর্গাকে বাঘিনী নাম দিয়েছেন। সমাজের চোখে দুর্গা শুণ্ডিনী, স্মাগ্লারনী। দুর্গার তৈরি মদ খুব জনপ্রিয়। চিরোর সঙ্গে দুর্গার গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। তাদের প্রণয়ে কোন নোংরামি - ইতরতা ছিল না। তবুও সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে ওরা সমালোচিত হয়েছে। সমাজের চোখে চিরো ও দুর্গার জীবনের প্রেম ভালোবাসা ও জীবিকা দুইই ছিল অবৈধ। চিরো সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিপ্রথাকে ভেঙে চুরমার করে

দিয়েছে। চিরো উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং দুর্গা নিম্নবর্ণের বাগদি পরিবারের মেয়ে। চিরঞ্জীবের দিদি কমলার সঙ্গে বামপন্থী নেতা শ্রীধর দাসের বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। সে বর্ণভেদ প্রথাকে মেনে, কমলার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি। শ্রীধর দুর্গা ও চিরোর প্রেমের সম্পর্ককে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, রটিয়েছে মিথ্যা কলঙ্ক। দুর্গা সাহসী ও একরোখা, সে মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ককে ভয় পায় না। পুলিশ অফিসার বলাই সান্যাল সৎ ও আদর্শবান। তিনি শুধু ভয়ঙ্কর ও দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার নন, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে চিরোর প্রতি করুণা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। শুধু বলাইবাবুই নয় তার স্ত্রী মলিনারও বাঘিনী দুর্গা ও চিরোর প্রতি ছিল সহৃদয় করুণা, বলাইবাবু চোলাই মদের মহাজন অক্রূর দে ও সনাতন ঘোষের সঙ্গে যেরূপ কঠিন শাসন ও নিষ্ঠুর আচরণ করেন চিরোর সঙ্গে তিনি তা করেন না। মহাজন অক্রূর ও সনাতন বলাইবাবুকে অর্থের বিনিময়ে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। বলাই বাবু সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। চিরোকে বলাইবাবু থানায় ডেকে অবৈধ চোলাই মদের ব্যাবসা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন, উপদেশ দেন সুস্থ সামাজিক জীবনে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু তাঁর উপদেশ চিরোর কাছে উপহাস বলে মনে হয়। সে সমাজে সংগ্রামের পথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিল, সৎ সংগ্রামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে এসেছিল, বিনিময়ে তাকে থাকতে হয়েছে অনাহারে, প্রতারিত হতে দেখেছে তার দিদি কমলাকে। সভ্য সমাজের প্রতি তাই তার কোন আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই। বলাইবাবুর প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখান করে। চিরো চোলাই মদের ব্যাবসা করলেও সে কারো কাছে মাথা নত করতে চায় না। বলাইবাবু এতে ক্রুদ্ধ হন, তাকে ধরার জন্য আরো কঠোর হন। পুলিশবাহিনী নিয়ে সার্চ করেছেন দুর্গার বাড়িতে। সেখানেও তিনি ব্যর্থ হন। ভোলা ও কেষ্টকে ইনফরমার হিসাবে নিয়োগ করেন। চিরো ও দুর্গার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে তারা অশ্লীল মন্তব্য করে। ভোলা ও কেষ্ট একদা বাঁকা বাগ্‌দির দলের লোক ছিল। 'ওরা দুজনেই বাঁকা বাগ্‌দির মেয়ের প্রেম প্রার্থী ছিল।"

বামপন্থী কৃষক নেতা শ্রীধর দাস চিরঞ্জীবের অবৈধ চোলাই মদের ব্যাবসাকে সমর্থন করেনি। মেনে নেয়নি বাগ্‌দি পরিবারের মেয়ে দুর্গার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ককে। চোলাই মদের ব্যাবসা করার জন্য সে চিরোকে উপহাস করেছে, অপমানিত করেছে। দুর্গার বাবা অশিক্ষিত বাঁকা বাগ্‌দির চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গ্রাম ও শহরের আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঁকা ক্ষুধার্ত মেয়ের মুখে অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থ হয়ে অপরাধীর মতো দুর্গাকে বলেছে — "আমি জানি নরকে আমার ঠাঁই হবে না দুগ্‌গি।

জমি বিকিয়ে যেদিন আমাকে পেটের জ্বালা জুড়োতে হল, সেদিনই বুঝেছি, আমার মরণ ধরেছে।" সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন — "জমিদার - জোতদার - মহাজনেরা হাজার হাজার বছর ধরে এই নিরুপায় গ্রামের চাষীদের অত্যাচার করেছে, শোষণ করেছে। এখন সময় পাল্টাচ্ছে, জন্তুর মতো মুখ বুঁজে মার খাওয়ার দিন এখন ফুরিয়েছে, এখন হাজারো কণ্ঠে প্রতিবাদের গর্জনে ভরিয়ে তুলতে হবে গ্রামের আকাশ-বাতাস।"[৬৫] চিরো কৃষকসমিতি ছেড়ে চোলাই মদের ব্যাবসা শুরু করেছে। দরিদ্র কৃষকরা অভাবের তাড়নায় চোলাই মদের ব্যাবসা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। দুর্গা নিজে দল তৈরি করেছে। অঘোর কবিরাজের স্ত্রী অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় দুর্গার সঙ্গী হয়েছে। তৈরি করে চোলাই মদ। অঘোর কবিরাজ অসুস্থ ও নিঃস্ব। তার স্ত্রী সমাজকে ভয় পায় তবু বেঁচে থাকার তাগিদে গোপনে ঘরে মদ তৈরি করে। মেয়ে সুশীলা ও অচলা সংসারের দারিদ্র্য মোচনের জন্য দুর্গার নির্দেশে শহরে চোলাই মদ পাচার করে। উপন্যাসের অপর চরিত্র গুলি চিরোর সহকারী। সেও অভাব ও দারিদ্র্যর হাত থেকে মুক্তি পেতে অর্থের সন্ধানে শহরে যায়। কিন্তু নিরাশ হয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসে। গুলির মতো অসহায় ও নিরাশ্রয় ছেলেদের সৎ ভাবে বাঁচার কেউ পথ দেখায়নি। মহাজন অক্রূর দে প্রথম তাকে চোলাই মদের ব্যাবসায় নিয়োগ করে। সেখানে যে প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে। চিরোর কাছে সে পেয়েছে আশ্রয়, দুর্গার কাছে পেয়েছে ভালোবাসা। পুলিশ অফিসার বলাইবাবু তাকে থানায় ডেকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছেন। চিরো বলাইবাবুর অন্যায় আচরণকে মেনে নিতে পারেনি। সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে বলাইবাবুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বলাইবাবু আইনের ক্ষমতার বলে জোর করে সকলকে গোলামে পরিণত করতে চান। চিরোকে একদিকে পুলিশ অফিসার বলাইবাবু ও অন্যদিকে কৃষকনেতা শ্রীধর দাস কোণ ঠাসা করতে চায়। শ্রীধর দাস কৃষক সমিতি ছাড়ার অপরাধে চিরোকে শারীরিক আঘাত করেছে। অভিযোগ করেছে তার বিরুদ্ধে, সে নাকি দরিদ্র কৃষকদের চোলাই মদের ব্যাবসায় অনুপ্রাণিত করেছে। চিরো প্রতিবাদ করে শ্রীধর দাসের মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে। গ্রামের অসহায় দরিদ্র কৃষকরা অভাবের যন্ত্রণায় চোলাই মদ তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে, কৃষকরা দলে-দলে নিজের সামান্য সম্বলটুকু বন্ধক রেখে চোলাই মদের সরঞ্জাম ক্রয় করে। বেঁচে থাকার তাগিদে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে দ্বিধা করে না। চিরো বিধায়ক শ্রীধরকে পাল্টা অভিযোগ ক'রে বলে রাষ্ট্রের ভুল অর্থনীতির জন্য কৃষকরা সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশ ভাগ, দাঙ্গা কল-কারখানায় লক আউট, রাষ্ট্রনেতাদের ভুল পরিকল্পনায়

কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে বিপথে চালিত হয়েছে। চিরঞ্জীবের মতো শিক্ষিত ছেলেরা রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে হতাশ ও নিরাশ হয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করেছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর বলাইবাবু চিরোকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে যেতে বললে চিরো সমাজকে বিদ্রুপ করে বলে — "তিলে তিলে মরণের ভাল পথ গুলোও দেখেছি স্যার, যার পেট ভরল না, তবু ঘরের ইজ্জৎ গেল, তার মরণের দুঃখের কথা খবরের কাগজে পড়তে আমার ঘেন্না করে।" শ্রীধর দাস সাধারণ কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে চিরোকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। কৃষক সমিতির সদস্য তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, বাজারে পোষ্টার দিয়েছে তার বিরুদ্ধে।

চিরঞ্জীব প্রতিবাদী। সে চোলাই মদের ব্যাবসা করলেও নীতিহীন প্রতারক নয়। এই উপন্যাসের অপর চরিত্র জটা। সে চোলাই মদের ব্যাবসায়ী ঠক, প্রতারক। জটা অর্থের লোভে চিরোর তৈরি মদে ভেজাল মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করে। অসহায় দরিদ্র বীণাকে অর্থের লোভ দিয়ে ব্যাবসার নামে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। সে বীণার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় ক'রে তাকে প্রতারিত করেছে। বীণা তাকে বিশ্বাস ক'রে তার সর্বস্ব দিয়েছে। জটা অর্থের লোভে বীণাকে দেহ ব্যাবসার পথে নামতে বাধ্য করেছে। সে আজ গর্ভবতী। চিরঞ্জীব জটার অন্যায় আচরণকে সমর্থন করেনি। প্রতিবাদ করেছে সে জটার প্রতারণার বিরুদ্ধে। চিরো ঘৃণার সঙ্গে তাকে তার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্চাশের দশকে দেশভাগ ও দাঙ্গার শিকার উদ্বাস্তু বীণার মতো অনেক অসহায় ও নিরাশ্রয় মেয়েরা প্রতারিত হয়ে সমাজচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। জটার মতো সুবিধাবাদী মহাজনরা নিজের ব্যাবসার স্বার্থে অর্থাৎ আবগারি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে মদ পাচারের জন্য বীণার মতো অসহায় দরিদ্র মেয়েদের নিয়োগ করত এবং ধীরে ধীরে তাদের বিপথে ঠেলে দিত। তারা আর সুস্থ স্বাভাবিক সমাজে ফিরে আসতে পারত না। চিরঞ্জীবের মতো আদর্শবাদী ও রাজনৈতিক সচেতন যুবকরা রাষ্ট্রের ভুল নীতি ও নেতাদের সুবিধাবাদ ও ভ্রষ্টাচারের ফলে দিগ্‌ভ্রান্ত হলেও লোভী অসৎ মহাজন জটা-সনাতনদের দলে নাম লেখান নি, মেয়ে পাচারের দালালদের ঘৃণ্যতম কাজকে সমর্থন করেনি। তাই চিরঞ্জীবের মদ তৈরির গোপন স্থান জটা, সনাতন, সোলেমন পুলিশকে জানালে সে পাল্টা আক্রমণ করে তাদের মদ তৈরির গোপন স্থানে। চিরঞ্জীব বলে, দুটো জাওয়ার (মদ তৈরির সরঞ্জাম অর্থাৎ যে পাত্রে মাল-মশলা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে উনুনে বসানো হয়, তার সবটা মিলিয়ে একটা নাম জাওয়া, খরচ ফিরে পাওয়া চাই। তার একটা দেবে সোলেমান যে সমিতি করে, চোলাইও করে "আর একটা দেবে সনাতন ঘোষ।" ও তো মন্ত্রীর দলের লোক, পুলিশ তার

বাপ। কিছু না দিক, পাঁচমন কয়লা আর চার মন গুড় দিতে হবে তাদের।" এভাবে চিরো পাল্টা জবাব দেয়। ভেঙে দেয় তাদের জাওয়া। সে কাপুরুষের মতো পুলিশের কাছে তাদের জাওয়ার সন্ধান দেয় না।

উপন্যাসের অপর চরিত্র হানিফ ও নন্দ। খুন না করেও সমাজে খুনি বলে তারা কুখ্যাত। মিথ্যা অভিযোগে জেলও খেটেছে তারা। এরাও ভূমিহীন কৃষক। অভাবের তাড়নায় এদের সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে। পেটের তাগিদে বড়লোক জোতদারের পাইক-পাহারাদারের কাজ নিয়েছে। চিরোর সঙ্গে এরা চোলাই মদের ব্যাবসা করে। শ্মশানের ডোম-ডোমনীরাও এ পথে নেমেছে। লেখক দেখিয়েছেন (পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে) সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপন্নতার কালে 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ, নিম্নবিত্ত ভদ্র অভদ্র সকলে চোলাই মদের ব্যাবসায় নেমেছে।

শ্রীধর দাস ও কৃষক সমিতির নেতারা পুলিশের কাছে চিরোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তবু চিরো তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেনি, মাথা নত করেনি, মেনে নেয়নি তাদের অন্যায়কে। চিরো পুলিশের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পুলিশ অফিসার বলাইবাবু চিরোর কাছে হার মানতে চান না। তিনি সমাজ থেকে চোলাই মদের ব্যাবসা নির্মূল করতে চান। তিনি সনাতন ঘোষ, অক্রূর দের অবৈধ ব্যাবসাকে সমর্থন করেননি। অথচ মন্ত্রীর নির্দেশে সনাতনের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবুও তাদের সঙ্গে বলাইবাবু সমঝোতা করেননি। সুরেশবাবু শাসনতন্ত্রের অন্যায় নির্দেশ মেনে নিয়েছেন, বলাইবাবু শাসনতন্ত্রের অন্যায় নির্দেশ মানতে চান না। তিনি যাবতীয় অবৈধ ব্যাবসা বন্ধ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চিরো রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যাচার ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে অভিমানে ও নিজের জৈবিক অস্তিত্বের তাগিদে চোলাই মদের স্মাগলিং এর নেশায় মেতে ওঠে। এই সূত্রে পরিচয় হয় দুর্গার সঙ্গে, গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। তাদের সম্পর্ক নিছক দেহের নয়, রয়েছে আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধাও বিশ্বাস। আবগারি ইন্‌স্পেক্টর বলাই সান্যাল চিরোকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমদিকে বলাইবাবু চিরোর প্রতি বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও করুণা দেখালেও শেষে কঠোর ও কঠিন হয়েছেন। চিরোকে প্রেমিকা দুর্গার উল্লেখের দ্বারা অপমান করে বলেছে - "বাগ্‌দি মেয়েকে রক্ষিতা রেখে, মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করে, তার বড় বড় কথা সাজে না।" দুর্গা প্রতিবাদ করেছে আবগারি পুলিশ বলাইবাবুর অশ্লীল মন্তবের বিরুদ্ধে। দুর্গাকে পুলিশ অখিলবাবু শ্লীনতা হানি করতে চায়। দুর্গা প্রতিবাদ করেছে তার হীন লোভ ও নোংরা আচরণের বিরুদ্ধে। দুর্গা অবৈধ চোলাই মদের কারবার করলেও সে

চরিত্র সম্পর্কে অতি সচেতন। দুর্গা আবগারি অফিসার বলাই ও পুলিশের ইনফরমার ভোলা ও কেষ্টর চোখে ধুলো দিয়ে অঘোর কবিরাজের মেয়ে সুশীলা ও অচলার সাহায্যে শহরে চোলাই মদ পাচার করে। অচলা বোরখা পরিধান করে বিবি সেজে গরুর গাড়িতে মদ পাচার করে। দুর্গার মতো এদের জীবনে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ঘর বাঁধার। প্রায় পিতৃসমতুল্য পাত্রের সঙ্গে এদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। পিতার শেষ সম্বল ভিটেটুকু বিক্রি করে অঘোর কবিরাজ মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছে। দুর্গার নির্দেশে ওরা আর শহরে মদ পাচার করতে রাজি হয় না। দুর্গা নিজে নববধূ সেজে চিরঞ্জীবের দেওয়া সোনার হার গলায় পরে গরুর গাড়িতে চোলাই মদ নিয়ে শহরে যাত্রা করে। সঙ্গে নিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য চিরঞ্জীবের দেওয়া ধারালো অস্ত্র। ইনফরমার ভোলা ও কেষ্টর কৌশল ও তৎপরতায় সে আবগারি সেপাইয়ের হাতে ধরা পড়ে যায়। ভোলা দুর্গাকে একাকী পেয়ে তার শ্লীনতাহানির চেষ্টা করে। দুর্গা নিজের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে ভোলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। দুর্গা নির্ভীক। সে ইন্‌স্পেক্টর বলাই সান্যালের কাছে স্বীকার করেছে যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভোলাকে খুন করেছে। খুন করার অপরাধে দুর্গার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সেই সময়ে গর্ভে ছিল তার চিরঞ্জীবের ভালোবাসার সন্তান। প্রেমিকা দুর্গার চরম শাস্তিতে চিরো সাময়িকভাবে হতাশ হয়েছে। বলাইবাবুর অনুশাসন ও শ্রীধর দাসের ভ্রান্ত নীতি একদা সে ভেঙে চুরমার করতে চেয়েছিল। বিনিময়ে প্রিয়তমা দুর্গাকে তাকে হারাতে হয়েছে। আজ সে অনুতপ্ত। দুর্গাকে হারানোর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভুলে সে অঙ্গীকার করে যে এরপর নতুন করে সৎ ও সংগ্রামের পথে সে চলবে। সমালোচক তাই বলেছেন — "দুর্গাকে হারানোর সাময়িক বিচ্ছেদকাতরতা অচিরেই সে কাটিয়ে উঠেছে। জীবন তাকে শিক্ষা দিল সঠিক পথে চলবার সামাজিক অভিজ্ঞতা দিল সংগ্রামের উষরক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে পদচারণার। তাই দুর্গার বিরহে চিরঞ্জীব শুধু নীরবে একাকী অশ্রুপাত করেনি, বরং বিচ্ছেদ তাকে শিখিয়েছে ভালো ভাবে বাঁচতে। স্বার্থ পরের মতো শুধু নিজের বাঁচার নয়, অপরেরও।"[৬৬] ভ্রান্ত পথ থেকে সে আবার ফিরে যায় শ্রীধর দাসের কাছে। সে পরাজয় স্বীকার করেনি। সে নতুন করে জোট বাঁধতে চেয়েছে, রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু শ্রীধর দাসকে "প্রায় ভেঙ্গে যাওয়া গলায় বলল, ফিরে এলুম শ্রীধরদা। আবার শুরু করব, আবার —।" লেখক দেখিয়েছেন ভালোবাসার জোরে একজন মানুষ কীভাবে সংগ্রামী হতে পারে। প্রেমিকা দুর্গার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে সে পরাজয় স্বীকার না করে ভালোবাসার জোরে তার আদর্শবান রাজনৈতিক নেতা শ্রীধর দাসের কাছে শঙ্কাহীন ভাবে ছুটে গেছে।

ব্যক্তিজীবনে লেখক সমরেশ বসু পারিবারিক ও রাজনৈতিক কারণে রাজনীতির প্রতি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সাময়িক ভাবে আস্থা হারালেও আজীবন তাঁর সেই দর্শনের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। উপন্যাসের উপসংহারটি সে কথাই প্রমাণ করে। ❑

৮

সমরেশ বসুর 'ছিন্নবাধা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসটি লেখক শিল্পীজীবনকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। লেখক এর পূর্বে শিল্পীজীবনকে নিয়ে 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৫২) এবং পরে 'টানাপোড়েন' (১৯৭৯), 'দেখি নাই ফিরে' (১৯৮৮) উপন্যাসগুলি লিখেছেন। 'ছিন্নবাধা' উপন্যাসের নায়ক অভয়। অভয় পিতৃপরিচয়হীন অবৈধ সন্তান। মা প্রমীলা দেহব্যবসায়ী, সে প্রমীলার গর্ভজাত সন্তান — এটাই তার সমাজে জন্মগত পরিচয়। মা প্রমীলার মৃত্যুর পর সে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বেঁচে থকার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অভয় ছিল ভূমিহীন। জীবিকার সন্ধানে মজুরের কাজ করেছে, আবার কখনো হাপড় টেনেছে কামারের ঘরে। আপনজন বলতে পৃথিবীতে তার কেউ নেই। অভয় শিল্পী। সে কবি ও গীতিকার অর্থাৎ কবিয়াল। শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা তার জন্মগত। চরম অভাব দারিদ্র্যের মধ্যে সে গান শিখেছে শিল্পী নিতাই ভট্টাচার্যের কাছে। দীক্ষাগুরু হিসাবে অভয় স্বীকার করেছে তাকে। গানের সূত্রে সে গেছে কাটোয়া ও বর্ধমান শহরে। তার স্বরচিত গান —

"তুমি আমার গানের শ্যাম রায়
তোমার কথা কেমনে ভোলা যায়।"

শিল্পী অভয় কবিগানের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। কিন্তু চরম অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে সে রিক্সা চালিয়েছে, লোকের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করেছে। অভয় স্বভাবশিল্পী। অর্থ পেলেও ও সব কাজে তার মন ভরেনি। গ্রামের আকর্ষণে সে আবার ফিরে আসে গ্রামে। তার স্বপ্ন সে বড় শিল্পী হবে। প্রতিকূল পরিবেশে সে

নিরাশ হয়নি। যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে সে এগিয়ে চলেছে। ব্যক্তিজীবনে অতি অল্পবয়সেই লেখক সমরেশ বসু নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। লড়াই করেছেন বেঁচে থাকার জন্য। লোকসংগীতের উপর সমরেশ বসুর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। যোগাযোগ ছিল বৈষ্ণব বাউলের মঠের আখড়ার সঙ্গেও। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বৈষ্ণব বৈরাগী। অভয় অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে গান বাঁধে, স্বপ্ন দেখে বড় শিল্পী হওয়ার। দীক্ষাগুরু নিতাই ভট্টাচার্যের নির্দেশে নবম দোল উৎসবে কবিগানের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিখ্যাত কবিয়াল শরত সাঁতরা। গানের আসরে কবিয়াল শরত সাঁতরা তরুণকবি অভয়ের পিতৃপরিচয় নিয়ে বিদ্রুপ করে, অপমানিত করে জারজ সন্তান বলে। পিতৃ পরিচয়ের জন্য সে অপমানিত হয়ে সাময়িক ভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়। তাই অভয়ের গান দর্শকের মনে দাগ কাটতে পারেনি। শরত সাঁতরা গানের শেষে অভয়কে সান্ত্বনা দিতে এলে রাগে, দুঃখে ক্ষোভে অপমানে নিজের অজান্তে কবিয়াল শরত সাঁতরার গালে সে আঘাত করে। অভয়ের এরূপ আচরণে দীক্ষাগুরু নিতাই ভট্টাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে জনসমক্ষে তাকে বেত্রাঘাত করেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ব্যর্থ হৃদয়ে সুরীনের প্রস্তাবে গ্রাম ছাড়তে রাজি হয় সে। সুরীন জন্মসূত্রে বাগ্‌দিপাড়ার বাসিন্দা। সেও অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় কর্মের সন্ধানে একদা গ্রাম ছেড়েছিল। সুরীন চাঁপাদানি চটকলের উইভিং মিস্ত্রিরি। জন্মস্থানের টানে প্রতিবছর সে নবম দোল উৎসবে গ্রামে আসে। প্রমীলার মৃত্যুর পূর্বে সুরীন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল — সে অভয়কে রক্ষা করবে। অভয়ের গান সুরীনের ভালো লেগেছে। কিন্তু গান করে জীবন ধারণ যে অনিশ্চিত তা সে অনুভব করতে পেরেছিল। অভয়কে ঘর সংসার করার জন্য সে অনুপ্রাণিত করে। অভয় উদাসীন। লেখক সমরেশ বসু গৌরীকে জীবনসঙ্গিনী করে যখন আতপুরে এসেছিলেন তখন খুব কম ভাড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আব্দুল মিস্ত্রীর বাড়িতে। বেঁচে থাকার তাগিদে কমিশনের শর্তে বিক্রি করেছিলেন ডিম, মুরগি, শাক-সব্জি চটকল সাহেবের কুটিতে। অনেক সময়ই তাঁদের থাকতে হয়েছে অনাহারে-অর্ধাহারে। দুর্দিনে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাস্টারমশাই সত্যভূষণ মজুমদার। সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তাঁকে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাকটরিতে ড্রয়িং এর চাকরি।

শহরতলি মালিপাড়ায় অভয়ের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। মালিপাড়ায় আধা-গৃহস্থদের বসবাস, নিকটে পতিতাপল্লী। আশ্রয় পায় সে আধা-গৃহস্থ সুরীনের সংসারে। সুরীনের রক্ষিতা ভামিনীকে

অভয় খুড়ি বলে সম্বোধন করে। সুরীনের প্রস্তাবে সে পতিতা শৈলর মেয়ে নিমিকে বিয়ে করতে রাজি হয়। শৈল একদা পতিতা ছিল। কিন্তু মেয়ে নিমিকে সে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করেনি। মেয়েকে সে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে সংসারী করতে চায়। এর জন্য প্রতিবেশী দেহোপজীবিনীদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে উপহাস, কটাক্ষ। মেয়ে নিমি পতিতাদের অনুকরণ করলে, মা শৈল মেয়েকে কঠোর শাসন করে। "আশে পাশের আধাগৃহস্থ প্রতিবেশীর ঠোঁট উল্টে হেসেছে, মাগির রকম দেখে মরে যাই। বলে মেয়ের রক্তের মধ্যে বেবুশ্যের বাস। উনি তাকে সতী-সাবিত্রী করতে যাচ্ছেন।" অভয়ের মতো নিমি ও পিতৃপরিচয়হীন। অভয় প্রায় রিক্তহস্তে সুরীনের সঙ্গে নতুন জীবনের সন্ধানে যাত্রা করেছে। সঙ্গে ছিল তার শুধু গানের বই-খাতা। নিজের জীবনের দুঃখ নিয়ে সে গান বাঁধে।

"জোনাকির আলো, দেখতে বড় ভাল
তাতে আগুন জলে না।"

শৈলের মেয়ে নিমির সঙ্গে অভয়ের বিয়ে স্থির হয়। নিমির সঙ্গে সে পরিচয় করে গান দিয়ে—

"গাঁয়ে আমার জন্মো কম্মো,
শহর আমি চিনি না যে।
সে আমাকে ডাক দিয়েছে
যে আছে এই শহর গঞ্জে।।"

এই ভাবে শিল্পী অভয় তার শিল্পীসত্ত্বা প্রকাশ করে। ভামিনী খুড়ি পরিচয় করে দেয় পতিতা সুবালার সঙ্গে। পতিতাপল্লীর মালিকানী রাজুমাসি ও সুবালা অভয়ের গান শুনে খুশি হয়েছে ও তার প্রশংসা করেছে। তাদের প্রশংসায় অনুপ্রাণিত অভয় স্বপ্ন দেখেছে শিল্পী হওয়ার। রাজুমাসি যৌবনকালে কীর্তন গাইয়ে ছিল। খ্যাতি ছিল তার পদাবলী গানের জন্য, বিখ্যাত কবিয়াল লোচনদাসের সঙ্গে সে গান গেয়েছে। রাজুমাসির অতীত জীবনের গানের ইতিহাস শুনে কবিয়াল অভয়ের সুপ্ত প্রতিভা উদ্দীপিত হয়েছে। সুবালাও দক্ষ গায়িকা। সুবালার গান শুনে অভয়ের শিল্পী প্রতিভা জেগে ওঠে। সুবালার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। এই কারণে হতাশ ও নিরাশ হয়ে সে বিপথে এসেছে। কিন্তু তার জীবনে ছিল অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা।

মালিপাড়ায় শুরু হয় অভয়ের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সে সন্ধান করে কর্মের, পরিচয় হয় চটকলের মিস্ত্রী অনাথের সঙ্গে। অনাথ বিপ্লবী ও সংগ্রামী। কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলন করেছে কোম্পানির মালিক শোষণের বিরুদ্ধে। জীবনে সে দু বার জেল খেটেছে। জেল থেকে ফিরে সে দেখেছে তার স্ত্রী-সন্তান বিনা চিকিৎসা ও অনাহারে মারা গেছে। সে আজ সর্বহারা। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে তার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনাথ কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে দশ বছর কর্মহীন ছিল। বিপ্লবী অনাথ শিল্পী অভয়কে গান বাঁধার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। অভয় কবিয়াল শরত সাঁতরাকে চড় মারার জন্য অনুতপ্ত, আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ। জীবনের প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দুঃখ আজও সে ভুলতে পারেনি। প্রতিবাদী অনাথ কবিয়াল শরত সাঁতরার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য অভয়কে সমর্থন করেছে। অনাথের অনুপ্রেরণাতেও অভয়ের সুপ্ত শিল্প প্রতিভা জেগে ওঠে, নতুন করে সে স্বপ্ন দেখে বড় কবিয়াল হওয়ার। কর্মের অনিশ্চয়তা নিয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে, বিষাদে ভরে যায় তার মন। সে সৎ ও পরিশ্রমের পথে অর্থ উপার্জন করতে চায়। তাই সে ঘড়ামির কাজ করতেও সংকোচবোধ করে না। সুরীন খুঁড়ো অভয়ের ঘড়ামির কাজে আপত্তি জানালেও অনাথ তাকে সমর্থন করেছে, বাহবা দিয়েছে অভয়কে। অনাথ সংগ্রামী। সে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। অনাথের প্রচেষ্টায় সে কারখানায় মিস্ত্রির কাজ পায়। শুরু হয় অভয়ের নতুন করে জীবন সংগ্রাম। একদিকে কারখানার মিস্ত্রির চাকরি অন্যদিকে গানের জগৎ। চাকরি পাওয়ার আনন্দে সে গান বেঁধেছে —

"জগতের একটি আজব কল
তার তিন ভাগ জল, একভাগ থল,
বলেছে ভূগোল।"

নায়ক অভয় চরিত্রের বিকাশে প্রধানত তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারী চরিত্রের প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্বে কবিয়াল গুরু নিতাই ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিক নেতা বিপ্লবী অনাথ, তৃতীয় পর্বে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা জীবন চৌধুরী। তার জীবনে এসেছে প্রধান তিনটি নারী — প্রথম তার বিবাহিতা স্ত্রী নিমি, দ্বিতীয় বারবনিতা সুবালা এবং তৃতীয়া আশ্রিতা ও আশ্রয়দাত্রী গিনি। উপন্যাসের প্রথম

খণ্ডে অভয় কবিয়াল শরত সাঁতরার অপমান ও দীক্ষাগুরু নিতাই ভট্টাচার্যের আঘাতে হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে শহরতলীতে আসে। শুরু হয় কর্মের সন্ধান এবং চাকরি গ্রহণ। কবিত্বের সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচিত হয় এর-পর থেকে। দেহ ব্যাবসায়ী শৈলর কন্যা নিমিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পর বিবাহিত জীবনে মান-অভিমানে ক্ষত বিক্ষত হয় সে। চাকরি জীবনকালে সে যেমন নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তেমনি এই সময়ে তার শিল্পী প্রতিভার ক্রমবিকাশও ঘটে। আবার শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে কারাবাসকালে বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করে সে। পরবর্তীকালে কবিয়াল হিসাবে সে সমাজে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পায়, পায় নাম-যশ। স্ত্রী নিমির মৃত্যুসংবাদে সাময়িকভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়।

অভয় কারখানার সকলের প্রিয়। কারখানায় সে হরিমিস্ত্রির সহকারী হিসাবে কাজ করে। অভয় ভবিষ্যতে পাকা মিস্ত্রি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। হরি মিস্ত্রি কবিয়াল অভয়কে গান গাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। চটকলে অবসর সময়ে সে গান বাঁধে। আমন্ত্রণ পায় কবিগানের আসরে, যাত্রাদলে আসরের গান গাওয়ার। কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে সে গানের টানে চলে যায় রাজুমাসির পতিতাপল্লীতে। সে সুবালার কাছে দেহের চাহিদা মেটানোর জন্য যেত না, যেত গানের নেশায়। অভয় সুবালার ঘরে পদাবলী গান গায়—

"সখি একি এপীরিতি
নাহি জানি রীতি
পরান রাখিতে নারি।
আসে যদি কালা
তুষিবে অবলা
পরান ধরিতে পারি।"

সুরীনের ইচ্ছাতে অভয় বিয়ে করে নিমিকে। বিয়ের আসরে সে স্ত্রী নিমির অভিমান নিয়ে গান বাঁধে —

"হায় কমল ফুটেও কেন পাতায় ঢাকা
ভোমরে ডেকে মধু লুকিয়ে রাখা
ভোমরার একি কপাল গো।"

বিয়ের পরও অভয় পতিতা সুবালার কাছে যেত। সুবালার সংস্পর্শে এসে অভয় গান বাঁধার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। স্ত্রী নিমি স্বামী অভয়ের সুবালার ঘরে যাওয়াকে মন থেকে নিতে পারেনি। বাসরঘরে ফুলসজ্জার রাতে সে অভিমান করে স্বামীর উপর। বিবাহের রাতে স্ত্রীর আচরণে অভয় আঘাত পায়। সান্ত্বনার জন্য ছুটে যায় অনাথ খুঁড়োর কাছে। অভয় সুবালার কাছে গেলেও তার অন্তরের গোপন স্থান অধিকার করেছিল স্ত্রী নিমি। অনাথের কাছে সান্ত্বনা পেয়ে সে গান রচনা করে —

"ভালোবাসা যায় না চেনা
সে কখন থাকে কখন থাকে না।
অধম অভয়ে তা বলতে পারে না।।"

সুবালাকে কেন্দ্র ক'রে তাদের দাম্পত্য জীবনে সাময়িক ভাবে চির ধরে। অনাথের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় কারখানা থেকে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে। স্ত্রী নিমি স্বামী অভয়কে বুঝতে পারে না। নিমি তার সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনায় সে স্বামীকে বিচার করে। স্ত্রীর বিরূপ আচরণে সাময়িকভাবে অভয় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ঈর্ষাপরায়ণ ভামিনী খুড়ির দেওয়া মদ সে নির্দ্বিধায় পান করে। একদিকে স্ত্রী নিমির বিরূপ আচরণ ক'রে ও অন্যদিকে ভামিনী খুড়ি তাকে নেশায় মত্ত ক'রে দিগভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

সাময়িকভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়লেও জীবনের মূলস্রোতে আবার সে ফিরে আসে। অনাথকে গুরু বলে স্বীকার করে। অভয় পেশায় কারখানার শ্রমিক হলেও সে সকলের কাছে পরিচিত হয় গায়ক হিসাবে। শুধু মালিপাড়ায় নয়, ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে তার শিল্পীপ্রতিভা। অভয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মহাজন শরত দাস তাকে রুপোর মেডেল উপহার দেয়। যাত্রাদলে অভয়ের গান শুনে সুবালাও খুশি হয়েছে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়েছে। স্ত্রী নিমি স্বামীর মেডেল পাওয়ায় খুশি হলেও সুবালার উচ্ছ্বাসকে মেনে নিতে পারেনি। সুবালার উচ্ছ্বাসের কারণে স্বামীর প্রতি রাগ ও অভিমান নিমির ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে অভয় কবিগানের আসরে নামে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার বিখ্যাত কবিয়াল লোচন দাস। বেতার শিল্পী হিসাবেও সে পরিচিত। একদা রাজুমাসি ও লোচন দাসের সঙ্গে সে গান গেয়েছিল। অভয় পরাজিত করে কবিয়াল লোচনদাসকে। জয়ী অভয়কে পুরস্কৃত করে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান

ভবানী চৌধুরী ও মহাজন শরত দাস। অভয়ের বিজয় সংবাদ শুনে খুশি হয়েছে কারখানার সহকর্মীর। আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছে অনাথও। প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী অভয়কে শ্রমিকনেতা অনাথ শ্রমিক সভায় গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। অপ্রস্তুত অভয় হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়, অস্বীকার করে গান করতে। লজ্জায় ও অপমানে অভয় সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। অভয়ের এরূপ আচরণে অনাথ দুঃখ পেয়েছে ও অপমানিত বোধ করেছে। সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য — "মজুর-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তার কবিগানের সৃষ্টিক্ষমতায় নতুন বিস্ফোরণ ঘটায়, তাতে নতুন বিষয়বস্তুও প্রকাশ নৈপুণ্য এনে দেয়, শিল্পীকে করে তোলে আরও আত্মপ্রত্যয়ী। সাধারণের মজলিসে সে একান্তই সহজ, কিন্তু সাজানো-গোছানো শ্রমিকসভায় সে বেমানান বারবার আহ্বান সত্ত্বেও বলে ফেলে যে সে গান গাইতে পারেনা, ফলে সাময়িক ভাবে সে অকৃত্রিম সুহৃদ অনাথের ও বিরাগভাজন হয়।"[৬৭]

অভয়ের প্রতিভা সৃষ্টিমূলক। তার গানের মধ্যেদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে শ্রেণি বিভক্ত সমাজ ও প্রতারিত সমাজের শোষণের কথা। সংগ্রামী অনাথ অনুভব করতে পেরেছে অভয়ের কবিগানের মধ্যে রয়েছে বিপ্লবের ইঙ্গিত। সুপ্ত রয়েছে আন্দোলনের বীজ ও সংগ্রামের বীজ। তার গানের কথা আসে দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে। অভয় সমাজের নিপীড়িত ও পতিতাদের নিয়ে গান রচনা করে। পতিতা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সে গান রচনা করে —

"যে মায়ের জাতি, সেই আমার ঘরের বউবোন;
তার কাছে আমরা প্রেম যাচি।"

অভয় তার গানের মধ্যদিয়ে সমাজের প্রতারিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন পতিতা নারীদের প্রতি। অভয়ের গান সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত — "অভয়ের গানের ধারা পুরাণ লোককথার জগৎ ছাড়িয়ে শ্রমিক-মজুর পতিতার মতো নিম্নজীবী মানুষের জগতে মিশে যায়।"[৬৮] বিখ্যাত কবিয়াল লোচনদাসের গানের উত্তরে অভয় যে গান গায় তা ভাগবত, পুরাণ ও লোককথা নির্ভরই নয় তা মানুষের জীবন নির্ভর —

"একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে
আপনার অঙ্গ

মহাকালের কত রঙ্গ

ও ভাই, হায় দিন চলে যায়

কান পেতে কালের কথা শোনো আপন বুকে।"

তার গানের মধ্যে নেই কৃত্রিমতা, নেই কবিয়ালের চাতুর্য —

"জীবনের জ্বালা নাহি যায়

জীবনের ভাব বোঝা দায়।"

কিন্তু কেন ? না —

"অভাই, অনাদায়ে ভাবের তবিলখালি থেকে যায়।

ভাব দিয়ে ভাব করে আদায়

জীবনের রঙ্গ বোঝা যায়।"

সমাজের ভোগীদের উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ করে সে বলতে পারে —

"মায়ের জাতি বলে ডাকলি যারে

আবার রাতে গিয়ে পয়সা দিয়ে কিনলি কারে।"

অভয়ের জিজ্ঞাসা সংসারে সব চেয়ে কী দামি ? সবচেয়ে শস্তা কী ? খাঁটি মানুষ বলে কাকে ? কবিয়াল এর উত্তর গানের মধ্য দিয়ে দেয় —

"লোক বলে, সোনা দামি, হীরা দামি

আর দামি জহরত

এতে সংসার মেনেছে বশ

সর্বজনের মতো।

তবে একবার চেয়ে দেখ নিজর দিকে

কান পেতে কালের কথা শোন হে বুকে।"

অভয়ের রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যা তার গানের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"থাকলে ট্যাকে কড়ি কিনতে পার দুনিয়া খানি
আর কী দিয়ে কিনতে পার মানুষ একখানি।
মানুষের মতো মানুষের চেয়ে দামি কিছু নাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই।
তাই ; একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে।"

মানুষের শ্রেণিবিভাগ অর্থাৎ বৈষম্যকে অভয় সমর্থন করত না। মানুষের জাত এক —

"খাটি মানুষের কোন জাত নেই।
জগতের মানুষকুল একে অপরের ভাই।"

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর মানুষের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। সমাজের ভদ্রসমাজ থেকে অপাংক্তেয় মেথর বস্তির লোকজনের সঙ্গে লেখকের ছিল নিবিড় সম্পর্ক।

কবিয়াল লোচনদাসকে পরাজিত করে বিজয় মাল্য নিয়ে অভয় বাড়ি ফিরে স্ত্রী নিমির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ সুবালা বিজয়ী অভয়কে পাঁচটাকা উপহার দিয়েছিল। নিমি তা মেনে নিতে পারেনি। স্ত্রীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভয় আবেগে ছুটে যায় গভীর রাতে সুবালার কাছে একটু ভালোবাসার জন্য, সান্ত্বনার জন্য। কিন্তু সেখানেও সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নেশায় উন্মত্ত সুবালা গভীর রাতে অভয়কে প্রত্যাখ্যান করে। স্ত্রী নিমি ও সুবালার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। জীবনের প্রতি জন্মেছে তার ঘৃণা ও অনীহা। বিষাদে ও দুঃখ-আঘাতে জর্জরিত হয়ে অভয় দিগভ্রান্ত পথিকের মতো যাত্রা করে অপরিচিত ধাঙর বস্তিতে। অন্ধকার পথে মদ্যপ স্বামীর হাতে প্রহৃত বিবস্ত্র মাহুনিকে পথ থেকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেয় বাড়িতে। মাহুনিও তার স্বামী সহদেবের ধারণা হয় অভয় ভগবান রামজি। কুসংস্কারাছন্ন সহদেব স্ত্রী মাহুনির শরীর ভোগ করার জন্য অনুরোধ করে অভয়কে। মাহুনি নিজেও তার দেহ সঁপে দিতে প্রস্তুত। অভয় এদের অনুরোধ প্রত্যাখান করে। সে নিজে দেহোপজীবিনীর পুত্র হলেও নারীকে সে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তাই সে বাড়ি ফিরে জানতে পারে স্ত্রী নিমি সন্তানসম্ভবা। অতীতের গ্লানি-অভিমান

ভুলে উভয়ে নতুন ক'রে একে অপরকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। অভিমানিনী নিমি বিবাদ ঈর্ষা সংশয় সন্দেহ ভুলে অভয়কে নতুন করে আপন করে নিতে চায়। নিমি অকপটে স্বামীর কাছে স্বীকার করে নিজের অপরাধের কথা, দুর্বলতার কথা। "সারা রাত আমি ঘুমোইনিকো কী যে কষ্ট হচ্ছিল। কী করব আমি ? আমার মন খারাপ হয়ে যায়; আমি সামলাতে পারি নাকো। তোমাকে কষ্ট দি। আমারও কষ্ট হয়।"

অনাথের সংস্পর্শে এসে অভয় নতুন করে জীনের সন্ধান পায়। অনুপ্রাণিত হয়ে সে গান রচনা করে —

"ওহে জীবন আমি তোমার বেড় পাইনা।
কেঁদে কেঁদে মরি আমি
খুঁজে বেড়াদিন খানি।
এ কেমন রূপের আকূল মাপতে পারি না।।"

সমালোচক হিতেন্দ্র মিত্র যথার্থই বলেছেন — "অনাথের সংস্পর্শে ও বন্ধুত্বে অভয়ের শিল্পীজীবন যেমন বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি সাংসারিক জীবনেও অনেক বেদনায় সান্ত্বনা লাভ করে।"[৬৯] অনাথের মাধ্যমেই শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে শিল্পী অভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

অভয়ের গান বঞ্চিত প্রতারিত মজুরদের শ্লোগান ওয়ে ওঠে। কোম্পানি সন্দেহ করে শিল্পী অভয়কে। তার বিপ্লবী গান শ্রমিকদের আন্দোলনের পথে যেতে উদ্দীপিত করেছে। বিদ্রোহী করে তুলেছে শ্রমিকদের। কোম্পানির ম্যানেজার অভয়ের গানের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন লক্ষ করে। তার গানের মধ্যে শ্রমিকদের তাড়িত করার ইঙ্গিত পায় তারা। কবিয়াল অভয়ের বিপ্লবী গান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা পছন্দ করে। কবিয়াল অভয়ের কবিগান কীভাবে প্রতারিত ও শোষিত শ্রমিকদের বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছে তা সমরেশ বসু উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাসে।

কবিয়াল অভয়কে কারখানার সকলে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে সমীহ করে। সে শুধু একজন কারখানার সাধারণ শ্রমিক নয়, সে কবি ও গায়ক। কোম্পানির সন্দেহ অভয়ের বিপ্লবের গান শ্রমিকদের বিদ্রোহী করে তুলবে। কলকাতার শ্রমিক ইউনিয়নর সম্মেলনে সে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পায়। সেখানেও

অভয় বিজয়মাল্য নিয়ে ফেরে। গ্রাম থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়ে তার সুনাম। অভিনন্দন জানায় গোবর্ধন ডাক্তারের ছেলে গণেশবাবু। আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছে সে বিপ্লবী কবিয়াল জীবন চৌধুরীর কাছ থেকে। জীবন চৌধুরী অবশ্য অভয়ের পার্টির নির্দেশে গান করাকে সমর্থন করেনি কেননা, এতে দলের লাভ হবে, কিন্তু অভয়ের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীসত্তা বিনষ্ট হবে।

অনাথের নেতৃত্বে অভয় শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। কোম্পানির মালিক কারখানায় যন্ত্রচালিত মেশিন বসিয়ে কৌশলে শ্রমিক ছাঁটাই করে। শ্রমিক ছাঁটাই ক'রে কোম্পানি ব্যয় সংকোচ করতে চায়। প্রতিবাদী শিল্পী অভয় কোম্পানির অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাইকে সমর্থন করেনি। সে ছাঁটাই কর্মীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গান বাঁধে —

"ওরে ভাই শোনরে মজুরদল
হুজুরের ক্ষুধা নাকি লাখ খোরাকি
আমার ক্ষুধার তরে হব তল
বাঁচতে যদি চাস ময়দানে দাঁড়াস
(ওদের) মুনাফা কল করতে হবে রসাতল।"

প্রতারিত শোষিত শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে সে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে অভয়কে যেতে হয় জেলে। অভয় ও নিমির দাম্পত্য জীবন সুখের ও মধুর হয়ে ওঠে। স্বামীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় নিমি পঞ্চমুখ। প্রত্যাশা করেছে তার গর্ভের সন্তান যেন অভয়ের মতে বড় গায়ক হয়। মা শৈলকে হারানোর দুঃখ যন্ত্রণা স্বামীর সোহাগ ও ভালোবাসায় ভুলতে বসেছে সে। ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামী অভয়ের জেল যাত্রাতে সে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। নিমির চরম সুখের মুহূর্তে সে মাতৃহারা হয়। মা শৈলর মৃত্যুতে সে দুঃখ পায়, মর্মাহত হয়। অভয় জেলে গেলে তার আঘাত আরও বড় হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর কারাবরণ সে মেনে নিতে পারেনি। অভয়কে সে ভুল বুঝেছে। স্বামীকে অভিযোগ করে বলেছে — "এদ্দিন ধরে আমাকে একে ফোঁটা ভালোবাসনিকো ?" অভয়ের প্রতি ক্ষোভে অভিমানে নিমি বলেছে বয়স থাকলে সে রাজুমাসির পতিতা পল্লিতে সদস্য হত। নিমির সন্দেহ জাগে মনে স্বামী সম্পর্কে, তার মনে হয় স্বামী তাকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, প্রতারিত করেছে। অন্যদিকে

অভয়ের কারাবাস ক্রমশ বেদনাবহ হয়ে ওঠে। কারাজীবনের বেদনার মধ্যদিয়ে সে জীবনের সত্য উপলব্ধি করে। অভয় শিল্পী, শিল্পের বহিঃপ্রকাশ মুক্তজীবনে। বন্দীজীবনে সে ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। বিছিন্ন হয়ে পড়ে বাহিরের জগতের সঙ্গে। জেলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও নজরুলের কবিতা পড়ে অভয় ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নানা প্রশ্ন জাগে তার মনে —যন্ত্রচালিত মেশিনের অপরাধ কী ? যদিও তার প্রশ্নে বিপ্লবী শ্রমিক নেতা রেগে যায়। কারণ কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। যন্ত্রচালিত মেশিনের সাহায্যে কারখানায় অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। কোম্পানির মূল লক্ষ ছিল শ্রমিক ছাঁটাই করা। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অনন্তকুমার চক্রবর্তীর অভিমত স্বাধীনতার পরবর্তীকালে — "চটকল মালিকদের 'র‍্যাশনালাইজেশন', শ্রমিক ছাঁটাই, প্রতিরোধের চেষ্টা, সমাবেশ গ্রেপ্তার — এগুলো সে-সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।"[৭০] অভয় নিজেকে প্রশ্ন করে — কোম্পানির অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সে অন্যায় করেনি। কিন্তু তাকে কোম্পানি অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করাকে সে মেনে নিতে পারেনি। কোম্পানি গ্রেপ্তার করেছে শ্রমিক নেতা অনাথ ও গণেশ বাবুকেও। বন্দী কারাগারে অভয়ের মনে পড়ে স্ত্রী নিমির কথা। স্ত্রী নিমির বিরহে তার হৃদয় থেকে গান বেড়িয়ে আসে —

"আমি তোমা ছাড়া জানি না গো
তুমি তা জান না
হায় বাদীকে বিবাদী করে
উল্টে সাজা দিলে মোরে
আমার ব্যথা কেউ বোঝে না।"

জেলের কষ্ট অভয়ের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। বন্দী জীবনে অভয়ের কষ্টের কথা শুনে গণেশবাবু রেগে যায়। সে অভয়কে বিদ্রুপ ক'রে বলে — এই পথে আসা তার উচিত হয় নি, উচিত ছিল কবিয়ালি করা। অভয় গনেশের যুক্তিকে মেনে নিতে পারেনি। আন্দোলনের পথে সে স্বেচ্ছায় এসেছে। আদর্শ ও বিপ্লবের পথ তাকে দেখিয়েছে শ্রমিক নেতা অনাথ। অনাথ নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে এসে শ্রমিক নেতা হয়েছে। গণেশবাবু উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তার ধারণা কবিয়ালরা গ্রাম্য অশিক্ষিত। এই দুই নেতার মানসিকতার পার্থক্যকে স্পষ্ট করতে গিয়ে সমালোচক হিতেন্দ্র মিত্র যা বলেছেন তা যথার্থ — "একই

রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও গণেশবাবু ও অনাথের পার্থক্য অনেক। অনাথ যেখানে রাজনীতির বোধ লাভ করে স্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে, সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গণেশ রাজনৈতিক বোধ ও উপলব্ধিকে গড়ে তুলতে চায় কেতাবী জ্ঞান থেকে।"[৭১] মতবিরোধ ঘটে অভয়ের সঙ্গে গণেশবাবুর। অভয়ের সঙ্গে জেলে পরিচয় হয় কবি শোহরের। শোহর জগদ্দলের শপঘরের শ্রমিক। আপনজন বলতে কেউ নেই তার। পূর্বেও সে জেল খেটেছে। সে মাসিক যা পারিশ্রমিক পায় তার সামান্য নিজের জন্য রেখে অন্যকে দান করে। শোহর ভজন গায়, কখনও গায় তুলসীদাসের রামায়ণ। অভয় জেলে গান্ধীকে নিয়ে গান রচনা করে। এ নিয়ে অভয়ের সঙ্গে গণেশবাবুর মতবিরোধ ঘটে। গণেশবাবুর কাজে কবিয়ালারা স্থূল, অর্বাচীন। সমালোচকের মনে হয়েছে — "শিক্ষিত গণেশবাবুদের মতো নেতার কাছে কবিয়ালরা গ্রাম্য অশিক্ষিত। কিন্তু অভয়ের এই কথায় মন মানে না রবীন্দ্রনাথের কথায় সে আত্মশক্তি খোঁজে - 'আমায় বহিবারে দাও শকতি'।"[৭২] কারাবাস কালে অভয় অনুভব করেছে জীবনকে। সমরেশ বসু নিজেও অকপটে স্বীকার করেছেন — "কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে।"[৭৩] তিনি এও স্বীকার করেছেন যে জেলবাস তার জীবনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বন্দী জীবনই তাঁর দৃষ্টিকে করেছে স্বচ্ছ আর সুদূরপ্রসারী।" শিল্পী অভয় কারাগারে গান রচনা করেছে, কারাগারে কবি শোহরের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। গণেশবাবুর আদর্শ অভয় মেনে নিতে পারেনি জেলে সে মুক্তির গান গেয়েছে —

"ওগো মুক্তি দাও
এ আঁধার সইতে পারি না
ওগো জেলের বাঁধন ছাড়িয়ে দাও
এ যেন বিষম জীব যন্ত্রণা।"

জেলের মধ্যে নিঃসঙ্গ জেল ওয়ার্ডের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অভয়ের মতো ওয়ার্ডের জীবন যেন বন্দীজীবন। অভয় নিজের বন্দী জীবনের সঙ্গে ওয়ার্ডের বন্দী জীবনের সাদৃশ্যে গান রচনা করে—

"বন্ধু, তোমার আমার একই দশা
জীবন রাশির বাঁধা কষা।"

জেলজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে নিমির মৃত্যু সংবাদে দুঃখ পেয়েছে, হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়েছে অভয়। শ্রমিক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে সে আর কারখানায় কাজ পায়নি। মৃত্যুর পূর্বে নিমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। আশ্রিতা গিনি নিমির পুত্রকে লালিত পালিত করে। নিমির মৃত্যুর জন্য আবেগবশত সুবালাকে দায়ি করে। অন্তর থেকে সে সুবালাকে ঘৃণা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ ভ্রান্তি সাময়িক। অভয়ের জীবনে আদর্শ গুরু অনাথ যখন দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক তখন তার জীবনে পথ প্রদর্শক হিসাবে আবির্ভূত হয় প্রবীণ জীবন চৌধুরী মশাই, যিনি এককালে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। জেলার মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরাও তাকে সম্মান করতেন। আদর্শের দিক থেকে দলের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হয়। এখন সব ছেড়ে দিয়ে তিনি একা। নতুন কোন দলে যাবার তাঁর ইচ্ছে নেই। অভয়কে নতুন করে জীবনের পথ দেখালেন। তিনি চান না অভয়ের স্বকীয় শিল্পীসত্তা দলের স্বার্থে বিনষ্ট হোক। তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অভয়কে আদেশ দেন — "সারাজীবন রাজনীতি করে এখন দেখছি কিন্তু সুখসর্বস্ব ভোগী মানুষ শাসনের ক্ষমতায় ক্ষেপে উঠেছে। তুমি দল কর, যাই ই করো, লড়ে যাও। একলা তো লড়া যায়না। কিন্তু আসল ক্ষমতা চাই।" জীবন চৌধুরী অভয়কে বলেন - লড়াই তিনি করেছেন কিন্তু জিত তার হয়নি। জীবনবাবু অভয়কে জয়ের জন্য খাঁটি গান বাঁধার আদেশ দেন। পুরনো প্রথাকে ভেঙে মানুষের অন্তরের মধ্যে শক্তি যোগাতে বলেন।

অভয় নিমির মা শৈলর রেখে যাওয়া সঞ্চিত অর্থ ও সোনার অলঙ্কার দিয়ে নতুন ক'রে জীবন শুরু করে, মুদির দোকান দেয়। কিন্তু দোকানে তার মন বসে না। শিল্পীর প্রতিভা টেনে নিয়ে যায় শিল্পের দিকে। শুরু করে নতুন ভাবে গানের আসর। শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ। গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পায় সে দূর-দূরান্ত থেকে। গানের আসর বসে কারখানার তল্লাটে। তার গান শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে। নতুন ক'রে সংগ্রামের শ্লোগান হয়ে ওঠে —

"ওরে ভাই শোনরে মজুরদল।
ঐক্যবদ্ধ হও, নয়তো যাবে রসাতল।"

মানবপ্রেমিক অভয় গায়ক হিসাবে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। গণেশবাবু তার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। ক্রমশ দূরে সরে গেছে অনাথ। পার্টির ইউনিয়ন থেকে পায়নি লোকশিল্প সম্মেলনে গান গাওয়ার অনুমতি। অনুমতি না পেয়ে অভয় যেমন হতাশ হয়েছে, তেমনি বিভ্রান্তও হয়েছে। এই পর্বে অনাথ

রাজনৈতিক আদর্শচ্যুত হয়েছে। বিভ্রান্ত অভয়কে সঠিক পথ দেখান জীবন চৌধুরী। একদিকে বন্দীজীবনের যন্ত্রণা, স্ত্রী নিমির আকস্মিক মৃত্যু, অপরদিকে অনাথ ও গণেশবাবুর বিরূপ আচরণে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়, শক্তি চায়। সে চেয়েছিল, জীবন ধারণের বাহ্যিক শক্তি নয়, অন্তরের শক্তি। স্ত্রী নিমি তাকে অপরাধী করে গেছে, নিমিহীন জীবন বয়ে যাবার সে শক্তি চায়। জীবন চৌধুরীর প্রচেষ্টা ও যোগাযোগে সে কলকাতায় লোকশিল্পী অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে। তা জেনে অভয় জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা অনুশোচনা ভুলে যায়। শুরু করে নতুন ক'রে গানের রেওয়াজ, আনন্দে উল্লসিত হয়ে ছুটে যায় সুবালার কাছে। জীবন চৌধুরীর উপদেশ ও আদেশে অভয়ের মনের সংশয় দূর হয়। অভয় নতুন করে সংগ্রাম শুরু করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে মুচিপাড়ায় যায়। সেখানে হারু বায়নের সঙ্গে রেওয়াজ করে। মুচিপাড়ায় যাওয়া নিয়ে খুড়ি ভামিনী ও আশ্রিতা গিনি আপত্তি করেছিল। কিন্তু শিল্পীর কোন জাত নেই। অভয়ও মানে না জাতিভেদ। যদিও মুচিপাড়া থেকে অভয় ফিরলে গিনি নীরবে গঙ্গাজল ছোটাতো। কলকাতায় শিল্পী সম্মেলনে বিখ্যাত গায়ক বিজয় হরিকে পরাজিত করে অভয় বিজয়মাল্য পায়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছড়িয়ে পড়ে তার শিল্পপ্রতিভা। কেউ লিখেছে, কবি গায়ক অভয় দাসের যুদ্ধ ও শান্তির পালা, সমাজ সচেতন কবি গায়ক অভয় দাস। অভয়ের গানের বিষয় ছিল সমাজের জলন্ত সমস্যা, শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার, অবহেলা। অভয়ের বিজয় সংবাদ পেয়ে জীবনবাবু তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অভয়ের গান যেমন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সরকারের নীতিহীন রাজনীতি, আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে গান রচনা করেছে। গানের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের বিশৃঙ্খলাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। বিজয়ী শিল্পী অভয়কে অভিনন্দন জানায় শ্রমিক নেতা অনাথ, ভুলে যায় অতীতের মত পার্থক্যের কথা। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অনন্তকুমার চক্রবর্তী বলেছেন — "অভয় আর অনাথের সাধনা শেষ পর্যন্ত একটা বৃহৎ সামান্য ভূমিতে এসে গেল, তাই উভয়ের মধ্যে এই প্রাণের সখ্য। একজন নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, অন্যজন তার প্রতিভায়। তাই সাময়িক ভুলবোঝাবুঝিও অভয়ের কাছে অনেক যন্ত্রণার কারণ - তার আন্তরিক নিঃসঙ্গতার অন্যতম হেতু।"[১৭৪]

অভয়ের শিল্পীজীবনে পতিতা সুবালা ও আশ্রিতা গিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অভয় কারাবাসকালে অনাথ গিনি অভয়ের পরিবারে আশ্রয় পায়। কিন্তু সে শুধু আশ্রিতা হয়ে থাকেনি,

আশ্রয়দাত্রীও হয়ে ওঠে। মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত করেছে নিমির পুত্রকে, পালন করেছে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব। গিনি এখানে স্বতন্ত্র স্বভাবের। নিমির মতো অভয়ের কাছে গিনির কোন চাওয়া পাওয়া, অভাব-অভিযোগ, রাগ-অভিমান কিছুই নেই, আবার সুবালার মতো তার জীবনে কোন হাহাকারও নেই। গিনি অভয়ের সাফল্য ও বিজয় সংবাদে খুশি হয়েছে। নীরবে ও গোপনে অহঙ্কারবোধও করেছে সে অভয়কে নিয়ে। আনন্দে সে চোখে কাজল দিয়ে, পায়ে আলতা পড়ে, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে অভয়ের পুত্রকে নিয়ে সারা পাড়া ঘুরেছে। তার হৃদয়ে রয়েছে অভয়ের প্রতি গোপন ভালোবাসা। সে ভালোবাসা নীরব। নেই কোনো বহিঃপ্রকাশ। অভয় নিজেও অজান্তে ভালোবেসেছে গিনিকে। নিমি ছিল অভয়ের জীবনে প্রথম প্রেমিকা, যদিও সুবালাকে কেন্দ্র ক'রে তার দাম্পত্য জীবন ক্রমশ তিক্ততায় পরিণত হয়। গিনির ভালোবাসা প্রসঙ্গে সমালোচক অনন্তকুমার চক্রবর্তীর অভিমত — "গিনির মধ্যে কাম্য পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা সর্বদাই সেবার মাধুর্যে সংযত, ছায়াময়। অনেকটা নিসর্গপ্রকৃতির মতোই সব কিছুকে সহজে গ্রহণ করতে পারে এমন একজন নারীকে অভয়ের বড়ো প্রয়োজন ছিল।"[৭৫]

সুবালা শিল্পী অভয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে অঙ্কুরিত করেছে। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ পেলে সুবালাও বড় শিল্পী হতে পারতো। দাম্পত্য জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে বারবণিতাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রাজুমাসির পতিতালয়েও সে ছিল অসুখী। অত্যধিক মদ্যপান করে সে নিজের উপর অত্যাচার করেছে। কিন্তু তার মনে অনেক আশা অনেক স্বপ্ন ছিল। এই সুন্দর পৃথিবী সে ছেড়ে যেতে চায় না। তাই সে বলেছে - "আমি কী করব? আমার মরতে ভয় করে।" সামান্য ভুলের জন্য পুলিশ তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে, নির্মমভাবে আঘাত করেছে, রক্তাক্ত সুবালাকে অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী রেখেছে। প্রতিবাদী অভয় সুবালার উপর পুলিশের নির্যাতনকে মেনে নিতে পারেনি। অভয়ের চেষ্টাতে সুবালা জেল থেকে ছাড়া পেলেও পুলিশের প্রহারে তার মৃত্যু হয়। সুবালা তার মৃত্যুকে সহজে মেনে নিয়েছে। কারো উপর নেই তার রাগ ক্ষোভ মান অভিমান। অভয় শুধু শিল্পীই নয় মানুষের প্রতি ছিল প্রকৃত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তাই পতিতা লাঞ্ছিতা সুবালার পাশে দাড়াতে সে কোন সংকোচ বোধ করেনি। কারাগারে বন্দী সুবালাকে ছাড়াতে গিয়ে শিল্পী অভয় পুলিশের দ্বারা অপমানিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। তবুও সে প্রতিবাদ করে পুলিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সে গান বেঁধেছে অসহায় সুবালার জীবন কাহিনি নিয়ে। গানের মধ্য দিয়ে সে প্রতিবাদ করেছে। অভয় শিল্পী, তাই শিল্পের মধ্য দিয়ে সে প্রতিবাদ করেছে। শিল্পী জীবন যে

সংগ্রামের ও সাধনার — জীবনের নানা পর্বে সমরেশ যা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছেন তাই-ই প্রকাশিত হয়েছে অভয় চরিত্রের মধ্যদিয়ে। একজন শিল্পী কেবলমাত্র আপন মনে শিল্পচর্চা করেন না, তিনি সমাজ ও শ্রেণি বিচ্যুত সাধক মাত্র নন — একথা সমরেশ যেমন নিজে বিশ্বাস করতেন, তেমনি অভয় চরিত্রের মধ্যদিয়ে সেই বিশ্বাসকেই রূপায়িত করেছেন। স্মরণীয় যে, সমরেশের এই দর্শন তাঁর প্রথম রচিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের মহিম চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে। ❑

৯

সমরেশ বসুর 'জগদ্দল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস প্রকাশের পনেরো বছর পর (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে)। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনির পরিণতি দেখা যায় 'জগদ্দল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসটি লেখক দীর্ঘসময় ধরে রচনা করেছেন। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের সময়কাল ১৮৬০ থেকে ১৮৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'জগদ্দল' উপন্যাসের পটভূমিটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক সমরেশ বসু দেখিয়েছেন কৃষকদের ভূমি থেকে উৎখাত করে কেমনভাবে চটকল স্থাপন করা হচ্ছে তার চিত্রকে আর 'জগদ্দল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক আমলে চটকল স্থাপনের ফলে এদেশের গ্রাম জীবনের ভাঙনের চিত্রকে। লেখক সমরেশ বসু 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বৃদ্ধ চটকল কর্মী নবকুমার ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘ বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। 'জগদ্দল' উপন্যাসের উপাদান সমরেশ বসু নিজের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক সমরেশ বসু বলেছেন — "ভারতের আধুনিক শিল্পের মধ্যে চটকল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে চটকল নিমিত্ত মাত্র। তাকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের কথা, সমাজের কথা বলাই উদ্দেশ্য। সে মানুষ নিরন্তর গতিশীল। পরিবর্তনের ধারায় নানান পরিণতি; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সব শেষে মানুষেরই দিকচিহ্নগুলো চেনার চেষ্টা।"[৭৬] 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের একাধিক চরিত্র 'জগদ্দল' উপন্যাসে পাওয়া যায়। 'জগদ্দল' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র লখাই। তবে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে নায়ক লখাই

চরিত্রের মধ্যে যে সক্রিয় বিদ্রোহী ও প্রতিবাদমূলক আচরণ পাওয়া যায়, 'জগদ্দল' উপন্যাসে লখাই চরিত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায়না। এই উপন্যাসে তাকে হতাশ ও নিরাশ রূপে দেখা যায়। ষাটের দশকে অর্থাৎ 'বিবর' পর্বে লেখক সমরেশ বসু যেমন কলকাতা শহরের সামাজিক অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যাচার ও ভণ্ডামিকে। এই সময় লেখক মানসিক দিক থেকে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত তারই প্রভাব এই উপন্যাসের নায়ক লখাই চরিত্রের মধ্যে পড়েছিল। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক একাধিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন। সমরেশ বসু তার প্রথম পর্বের উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম ও অপরাজেয়তা দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের মধ্যদিয়ে সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারকে দেখিয়েছেন। ষাটের দশকে লেখক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যান। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে অবসাদে ভূগেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের লেখাতে প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করা যায়। সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে এর বিপরীত দিকটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পর্বে সমবেত মানুষের প্রতিবাদকে দেখিয়েছেন আর দ্বিতীয় পর্বে ঘূণ ধরা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানরহিত দশাটি দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক একাধিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক বারিদবরণ চক্রবর্তীর অভিমত "জগদ্দলের চটশ্রমিকদের সুখ-দুঃখ, মরা-বাঁচা সংগ্রামের সঙ্গে এক হয়েই নতুনভাবে নিজেকে গড়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন সমরেশ বসু।"[৭৭] মানব প্রেমিক জীবন শিল্পী সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ঔপনিবেশিক কোম্পানির চটকল স্থাপনের ফলে বাংলার কৃষকরা পূর্বপুরুষ বাপ-ঠাকুর্দার কঠোর পরিশ্রম ও রক্তের বিনিময়ে প্রাণের চেয়ে দামি চাষের জমি থেকে কেমনভাবে উচ্ছেদ হয়েছে, কীভাবে ভেঙে গেছে শতবছরের পুরনো গ্রাম ও সমাজ তার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন। বাংলার জাতীয় সম্পদ পাট। এই পাটজাত দ্রব্য থেকে যেমন তৈরি হত চট, আবার জুট কাটিং থেকে তৈরি হত ভালো পিঁজে সুতো, যা উলের সঙ্গে মেশানো হত এবং রপ্তানি করা হত আমেরিকায়। সারা বিশ্বে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা বাংলায় চটকল কারখানা গড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন কোম্পানি বাংলায় নতুন করে চটকল স্থাপন শুরু করে। "জার্মান থেকে জার্ডিন স্কিনাররা আসছে কাঁকিনাড়ায়। ডাণ্ডি থেকে আসছে জগদ্দলে। আমেরিকা থেকে ডানকান ব্রার্দাস

অতলান্টিক থেকে পাড়ি জমিয়েছে হুগলি নদীর দিকে।" চটকল স্থাপনের পূর্বে বাংলায় ইংরেজ সাহেবরা নীল চাষ করে প্রচুর মুনাফা লুটেছে; নীল চাষিদের উপরও চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার এবং সারা বিশ্ব হা প্রত্যাশা করে চেয়ে আছে মাল চাই, আরও মাল, যেন পাট নয়, রূপা ও সোনার সূতো। কোটি কোটি রূপালি ও স্বর্ণ গুচ্ছ। বাংলার মাটি থেকে সৃষ্ট সম্পদ।" চটকল স্থাপনের ফলে ক্রমশ কৃষকরা ভূমিহীন হয়ে পড়ে। লেখক দেখিয়েছেন কোম্পানির সাহেবরা চটকল স্থাপনের জন্য কীভাবে জমিদার নায়েব ও গোমস্তাদের সাহায্যে কৃষকদের জমি দখল করেছে। জমিদার কোম্পানির স্বার্থে প্রজাদের জমি যেমন অধিগ্রহণ করেছে, তেমনি চালিয়েছে প্রজা কৃষকদের উপর শোষণ ও পীড়ন। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন আয়েসি, সুখ বিলাসী জমিদার শ্রেণির চারিত্রিক অধঃপতন ও ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। কোম্পানির স্বার্থে জমিদার নীলু বাগদির মতো চাষির চাষের জমি জোর করে ক্রয় করে। আজ সে ভিটে মাটি হারিয়ে সর্বস্রান্ত। নীলু চাষির মতো দুলেপাড়ার অসংখ্য কৃষকদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। জমিদাররা ভোগবিলাস সুখ স্বাচ্ছন্দ নিয়ে ব্যস্ত। গ্রাম ছেড়ে কেউ স্থায়ীভাবে, আবার কেউ অস্থায়ীভাবে কলকাতা শহরে বসবাস শুরু করেছে। "কলকাতার বাঁশ বনে বাড়ি ফেঁদে, চার ডবল দামে ঘেয়ো নির্জীব ঘোড়াওয়ালা ফিটন কেনেন, গায়ে ডবল ইংরাজি কুর্তা চাপান। উলটো মোজা পরেন, ডাইনেরটা বাঁয়ে, আর বাঁয়েরটা ডাইনে ইংরাজি বুট জুতো পরে চলেন খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে।" এছাড়া রয়েছে বিলাতি আরক, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে চিৎপুর থেকে পর্ণাঙ্গনা এনে রাত্রি যাপন। বিলাসিতা ও পর্ণাঙ্গনাদের পিছনে ব্যয়ের অর্থ জমিদাররা সংগ্রহ করে প্রজাদের কাছ থেকে। প্রজাদের উপর অধিক করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। পূর্বে জমিদারকে কৃষকরা খাজনা হিসাবে দিত ধান। এখন দিতে হয় কাঁচা টাকা। তবে রায়ত প্রজাদের রক্তের ধন বেশির ভাগটাই চলে যেত আবগারি বিভাগও সরকারের লাইসেন্স ও ট্র্যাক্স মেটাতে, অবশিষ্ট অংশ চলে যেত মোসাহেব ও ধর্মমন্দিরের পুরোহিতদের ভোগে। শহরের জমিদাররা সাহেবদের আচরণ অনুকরণে ব্যস্ত। জমিদাররা সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে ব্যস্ত, বিলাস ব্যসনে নিজেদের ভাসিয়ে দেন। ব্রাহ্ম, হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটান। ধর্মে এরা হিন্দু নন, ব্রাহ্ম নন, মুসলমান নন বা ক্রিশ্চানও নন, জাতে এঁরা জমিদার। শহরের জমিদারের সঙ্গে গ্রাম্য জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একে অপরের রক্ষিতা ভাঙানের জন্য ব্যস্ত। লেখক এই ভাবে জমিদার শ্রেণির চারিত্রিক স্খলনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। শুধু কি প্রজাদের উপর জমিদারের শোষণ ও পীড়ন চলেছে ? না,

এছাড়াও রয়েছে জমিদারের নায়েব মশাই, গোমস্তা ও গোঁসাইদের নির্মম অত্যাচার ও প্রতারণা। জমিদার এদের উপর দায়িত্ব দিয়ে ভোগ ও বিলাসে মত্ত। নিরক্ষর কৃষকরা খাজনার হিসাব বোঝে না। নায়েব মশাই একজমির খাজনা একাধিকবার গ্রহণ করে। জমিদারের অধিক খাজনা পরিশোধের জন্য প্রজা কৃষকরা মহাজনের কাছে বেশি সুদে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু সে ঋণ কৃষকরা আর কোনোদিন পরিশোধ করতে পারে না। ঋণের দায়ে কৃষকদের জমি নিলামে চলে যায়। সেন পাড়ার শ্যাম বাগদির মতো অসংখ্য কৃষকদের জমি নিলামে চলে যায়। কোন কৃষক যদি সময় মত জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে না পারে, তবে তা পরের বছর বেড়ে হয় চার গুণ। কৃষক অখিলের পাঁচ টাকা বাকি খাজনা বেড়ে হয় কুড়ি টাকা। খাজনা অনাদায়ে জমিদারের আমিন ক্ষমতার বলে অখিলের সব ফসল ক্রোক করে। অখিল এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। বেআইনিভাবে জমিদারের ফসল ক্রোকের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করে। মামলা লড়ার জন্য অখিল তার শেষ সম্বল ঘটি বাটি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কারণ জমিদার পেয়াদাকে ঘুষ দিয়ে অখিলের বিরুদ্ধে ফসল কাটার কোর্টে পাল্টা অভিযোগ করে। "ম্যাজিস্ট্রেটের পেয়াদা আসার সংবাদ পেয়ে পূর্বাহ্নেই সে ফসল কেটে ঘরে তুলেছে।" ফলে আইনের ফল হয় উল্টো। সর্বস্বান্ত অখিলের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জমিদার ছলে বলে কৌশলে আইনের সাহায্যে প্রজা কৃষকদের প্রতারিত করেছে। ভূমিহীন কৃষকরা অভাবের তাড়নায় বেঁচে থাকার তাগিদে কৃষক থেকে কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। 'জগদ্দল' উপন্যাসে মূলত চটকলকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের কথা মুখ্যত দেখানো হয়েছে। জমিদার মহাজন, নায়েব গোমস্তারা কীভাবে শ্রমিকদের নিয়তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে তাও দেখানো হয়েছে এ উপন্যাসে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ফলে বাংলার প্রজারা যেমন সর্বস্বান্ত হয়েছে, তেমনি মুনাফা লুটেছে জমিদার শ্রেণি। এইভাবে প্রজারা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। চৈত্রের হাওয়ার মত চার দিকে নিলাম, উচ্ছেদ, বে-দখল স্বত্ব, জবর দখল চলে। প্রজারা তাদের শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। অন্যদিকে নায়েব গোমস্তারা নিরক্ষর চাষিদের জমি জোর করে টিপসই দিয়ে ক্রয় করে। জমিদারের শোষণ ও পীড়নে ভেঙে যাচ্ছে কৃষকদের পরিবার। অখিল জেলে গেলে অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় তার স্ত্রী রাজমিস্ত্রির সহকারীর কাজ নেয়। নতুন করে ঘর বাঁধে রাজমিস্ত্রি গোলাম আলির সঙ্গে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলে ভেঙে যাচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি প্রথা। জমিদার আছে, কিন্তু তাদের

পূর্বের জমিদারি নেই, নেই আভিজাত্য, প্রাচীন গৌরব। তবুও তারা পূর্বের আভিজাত্য, অহঙ্কার বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর তাদের। সেন বাড়ির জমিদারি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, রয়েছে অবশিষ্ট পুরনো ভাঙা বাড়ি, ক্ষয়প্রাপ্ত লাল ইটগুলো শুধু দাঁতের মতো বের হয়ে আছে, কিছু আম-কাঁঠাল-নারকেল গাছ রয়েছে, পরিত্যক্ত পুকুরে জমেছে শ্যাওলা। কাছারি বাড়ি ও জেলখানার সংলগ্ন গুদামঘর যেন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেন বাড়িটি যেন নীরব আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকর বলতে রয়েছে মাত্র একজন ঝি, রয়েছে পুরাতন দুই কর্মহীন হিসাব রক্ষক। তাদের মনে এখনও অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। সেন বাড়ির মতো জমিদার হালদার বাড়ির অনুরূপ অবস্থা। সেন বাড়ির জমিদার সেনকর্তা নেই। রয়েছে দেওয়ান, গিন্নি ঠাকুমা, ছোট সেনকর্তা হৃদয়নাথ ও তার নববিবাহিত স্ত্রী বকুল। ছোট সেনকর্তা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। হুগলি স্কুলে পড়াশুনা করে। হুগলি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্ররা যেমন মদে আসক্ত, তেমনি পতিতাসক্ত। কিন্তু ছোট সেন কর্তা হৃদয়নাথ ব্যতিক্রম। সে মদও খায়না, পতিতালয়েও যায় না। তবুও স্ত্রী বকুল স্বামী হৃদয়নাথকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত। দুঃশ্চিন্তা করে কোন দিন হয়ত তার স্বামী মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরবে, নচেৎ কোন পতিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে। লেখক জমিদার শ্রেণির ইংরেজি শিক্ষিত পুত্রদের অধঃপতনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সেন বাড়ির জমিদারি ঋণের দায়ে নিলামে চলে যায়। তবুও আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর তাদের। সেন পাড়ায় আগন্তুক কোম্পানির লিটলজন ও ওয়ালিক সাহেবের আসার সংবাদ পেয়ে সাহেবদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের প্রস্তুতি নেয়। ভগ্নপ্রায় সেনবাড়ি বাগদি সেপাই আনে। মরচে পড়া গাদা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে সেপাইরা সিংহ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। খুলে দেওয়া হয় মজলিস ঘর। পরিষ্কার করা হয় আসবার পত্র, আলমারি ও বিলাতি বাসন পত্র। নাচ ঘরে রয়েছে নানা বাদ্যযন্ত্র। ছোটসেন কর্তা কোন দিন নাচঘরের দরজা খোলেনি। আসরও বসায়নি কোন দিন। সাহেব অর্ভ্যথনার জন্য দেওয়ান গিন্নিঠাকুমা নাতি ছোট সেনকর্তা ও তার স্ত্রীকে নতুন পোষাকে সজ্জিত করে। এমনকি সাহেব আসার সংবাদ পেয়ে কর্মহীন দুই হিসাব রক্ষক তৎপর হয়ে ওঠে। শূন্য কালির দোয়াতে একটু জল ঢেলে নেয়, পুরানো খাতাপত্রের ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে। দেওয়ান গিন্নিমা অধীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে সাহেব আসার। আর ঠিক তখন সাহেব দ্রুত ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। শুকনো রাস্তায় ধূলো উড়তে থাকে। সাহেব না আসায় সেন গিন্নিমা দুঃখ পায়, নিজেকে অপমানিত বোধ করে, আঘাত লাগে আত্মসম্মানে। সেন

কর্তা হৃদয়নাথ হতাশ ও নিরাশ হয়ে ঘোড়ার গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। নব পোশাকে সজ্জিত স্বামীকে স্ত্রী বকুলের মনে হয় যেন যাত্রাদলের সং দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেখক জমিদার শ্রেণির সাহেব তোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। সেন জমিদার নানা পরিবারে বিভক্ত। কেউ চাকরি সূত্রে প্রবাসী হয়েছে, আবার কেউ সব বিক্রি করে শহরবাসী হয়েছে। রয়েছে মাত্র দুই শরিক। এক শরিক নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। অপর শরিক ছোট সেনকর্তা। সেনপাড়ায় সাহেবরা এসেছিল চটকল স্থাপনের জন্য জমি পরিদর্শনে। জমির প্রয়োজনে নায়েব গোমস্তাদের বাড়িতে যায়। সাহেব আসার কারণ নিয়ে সকলের মনে প্রশ্ন জাগে। সেনপাড়ায় গড়ে উঠেছে ফোর্টগ্লাস্টার কোম্পানির কারখানা। কারখানার জমি ক্রয় করে অস্ট্রিয়ান কোম্পানি। লিটলজন ও ওয়ালিক সাহেব দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে নক্সা দেখে জমি পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করে। কৃষকরা জমি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। গুঞ্জন রটে যায়, শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে যায় সেনপাড়া। যেন ভূমিকম্পে দুমড়ে মুচড়ে গেছে সমগ্র গ্রাম। শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু হারানোর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে দুলে বুড়ি। হতবাক ও নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘোড়ার গাড়ির চাকায় উড়ে যাওয়া ধূলোর দিকে। এইভাবে শত বছরের পুরানো গ্রাম চটকল স্থাপনের ফলে ভেঙে যায়। কোম্পানির সাহেবরা নায়েব, গোমস্তা ও গোঁসাইদের সাহায্যে জোর করে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে। ঋণে জর্জরিত দেওয়ানরা অর্থের লোভে কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করে দেয়। এক জমির দলিল দিয়ে কোম্পানির কাছে একাধিকবার টাকা সংগ্রহ করে। অন্যদিকে মুনাফা লুটেছে নায়েব গোমস্তারা। নায়েবের সাহায্যে কোম্পানির কাছে খাস জমি বিক্রি করে। দেওয়ান গিন্নিমার জমিদারি ঋণের দায়ে নিলামে চলে যায়। কিন্তু গিন্নিমার আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর। রাতে নায়েবমশাই ছোট সেনকর্তা হৃদয়নাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে, আত্মসম্মানবোধের অধিকারী গিন্নিমা ফিরিয়ে দেয় নায়েবকে, সাধারণ একজন নায়েবের সঙ্গে নাতি হৃদয়নাথকে রাতে দেখা করার অনুমতি দেয় না। মিথ্যাকে আশ্রয় করে কোম্পানির টাকা আত্মসাৎ করতে তার রুচিতে বাধে। বিনা আমন্ত্রণে সাহেবদের ফ্যান্তা অনুষ্ঠানে ছোট সেনকর্তা হৃদয়নাথকে যেতে সে অসম্মতি জানায়। ঠাকুমা বলে — "যে উৎসবে তুমি নিমন্ত্রিত নও, সে উৎসবে তুমি যেতে পারোনা। তোমার বাপ ঠাকুর্দা একদা যে সম্মান ভোগ করে গিয়েছেন, তোমার ভাগ্যে যদি তা না জোটে, তুমি নিজে তার জন্য হাত বাড়াতে পার না।" একদিকে পুরনো জমিদারি ভেঙে যাচ্ছে। ঋণের দায়ে কৃষকদের মতো দেওয়ানদের জমি নিলামে চলে যায়, অন্যদিকে পাল ব্যবসায়ীরা স্বপ্ন মূল্যে নিলামের জমি কিনে জমিদারি পওন করে। পাল

ব্যবসায়ীরা সমাজে চিটে বলে পরিচিত, গুড়ের ব্যবসা করে তারা অর্থ উপার্জন করেছে। এই পাল ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে সমালোচক রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "ভাটপাড়ার চিটেরা এই সবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে করতে সদগোপ চিটেরা দেশের জমিদার হয়ে বসল।"[৮৮] লেখক দেখিয়েছেন পুরানো প্রজন্মের কৃষক শেষ পর্যন্ত কৃষি জমিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়, বেঁচে থাকতে চায় পুরানো মূল্যবোধের বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। প্রতিবাদী বিদ্রোহী লখাই তাদের প্রতীক। গ্রামবাসীরা লখাইয়ের মুখে যখন শোনে — "এ গাঁয়ের মানুষদের উচ্ছেদ করবে, কোম্পানি কারখানা খুলবে, তাই এয়েছেন গোরা" তখন যেন দৈববাণীর মতো উচ্ছেদনামা তাদের মর্মে আঘাত করে। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। হতাশ হয়ে পড়ে শেষ আশ্রয়টুকু হারানোর। জমিদারের শোষণ ও পীড়নে কৃষকরা চরম অভাব ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছে। তবু পুরাতন প্রজন্মের মানুষদের কাছে জমিদার তাদের আপনজন। জমিদারের প্রয়োজনে তারা জমি দিতে প্রস্তুত। তাই লখাই কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করতে অস্বীকার ক'রে অখিলকে বলে — "হ্যাঁ দিয়ে আসব, তুই চাইলে তোকে দেব। মুর্শিদাবাদের নবাব চাইলে তাকে দেব। কিন্তু সায়েবকে না।" নতুন প্রজন্মের তরুণদল কারখানার যন্ত্রাংশে অভিভূত। শ্যাম বাগদির ছেলে মধু দলের পাণ্ডা। এমনকি লখাইয়ের ছেলে বালক হীরা পর্যন্ত কারখানার যন্ত্রাংশে মুগ্ধ। মধুর মতো হীরাও স্বপ্ন দেখে কারখানার বড় মিস্ত্রিরি হওয়ার। অভাব ও দারিদ্র্য যেমন তাদের তাড়িত করেছে, তেমনি "সাহেব ন্যাওটা দল এক নতুন নেশায় মেতেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছেড়েছে লাঙল বলদ। ছেড়েছে তারা মাঠের জীবনের মায়া। সেদিকে তাদের কোনও টান নেই। মায়া নেই। যন্ত্র তার বিচিত্র কৌশল ও কৃতিত্ব নিয়ে তাদের ডাক দিয়েছে। তাদের চিরাচরিত বিবর্ণ পুরানো একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে নতুন ধরনের কাজে তারা এগিয়ে এসেছে। এদের সবাইকে যে ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন দুরবস্থাই একমাত্র ঠেলে দিয়েছে এ পথে, তা নয়। রক্তে তাদের দোলা লেগেছে, যন্ত্রের তারা প্রেমে পড়েছে।" মধু দেখেছে সংসারের চরম অভাব। জমিদারের শোষণ নীতির ফলে তাদের জমি নিলামে চলে যায়। যা জমি রয়েছে তাতে বছরের ছয় মাস খাওয়া জোটে না। জমিদারের শাসন ও শোষণ মধু মানতে পারে না। ঘর সংসারের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। কারখানার যন্ত্রাংশ তাকে টানে। নতুন প্রজন্ম যে চরম অভাব ও জমিদরের শোষণ নীতির ফলে কৃষিকাজ ছেড়ে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তা নয়, কারখানার যন্ত্রাংশে তারা অভিভূতও বটে। তাই সাহেবরা কারখানা স্থাপনের জন্য সেনপাড়ায় পরিদর্শনে এলে মধু, গোলাম ও বালক হীরা নির্বিকার। হাড়ি,

বাগদি, দুলে ও ডোম পাড়ায় মধুর প্রতিপত্তি প্রচণ্ড, সে দুঃসাহসিক। কারখানাব সাহেবদের সঙ্গে মধু হাওা লড়ে। লাঠি খেলায়ও সে ওস্তাদ। মধুর যেমন বিশ্বাস নেই দেব-দেবীর প্রতি, তেমনি বিশ্বাস নেই সামাজিক জীবন যাত্রার প্রতিও। তরুণ প্রজন্মের কাছে সে প্রিয়। হীরা মধুকে গুরু বলে স্বীকার করেছে। একই পরিবারের বাবা মা পুরনো মূল্যবোধে-বিশ্বাসী, আর মধু কারখানার যন্ত্রে মশগুল। সেনপাড়ায় সাহেব আগমন মধুকে বিচলিত করেনা, তাই মধু বিষ্টু বাগদিকে বলে — "সাহেব এসেছে তো কি হয়েছে, তোমরা এত ঘাবড়ে গেছ কেন ?" হীরার হাতের অস্ত্র হাতুড়ি নয়, কোম্পানির হাম্বর। পেয়ারা কাঠের হাতুড়িকে সে বলে হাম্বর। এই ভাবে কৃষক শ্রেণি কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ভূমিহীন কৃষকরা যেমন বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তেমনি ডোমেরা চামড়ার অভাবে জাতব্যাবসা ছেড়ে বাঁশের কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশ ও কাজের প্রাপ্য মজুরি না পাওয়ায় তাও বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক নিতাই বসুর উক্তি উল্লেখ্য — "বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরা চাষ-বাস, বংশগত পেশা প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে কীভাবে ক্রমশ ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে, মূল্যবোধ বদলাচ্ছে।"[৭৯] লেখক এই উপন্যাসে তা উপস্থাপন করেছেন। সেন পাড়ার পূর্বে কোম্পানি কৃষকদের জোর করে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে কাঁকিনাড়া, গারুলিয়া ও আগুড়ি পাড়ায় কারখানা গড়েছে। কারখানার নতুন পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সামাজিক পরিবারের ভাঙন দেখা গেছে। শ্যামের ভাই নারায়ণ। ঘরে তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে পতিতাসক্ত। মদনের স্ত্রী কাতুকে নিয়ে নারায়ণ চলে যায় কাজের সন্ধানে। নারায়ণের ভাইপো মধু মদনের দ্বিতীয় স্ত্রী মোহকে ভালোবাসে। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে মধু মোহকে নিয়ে চলে যায় চটকলে। কারখানার যন্ত্রকে কেন্দ্র করে যুব সম্প্রদায় নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক রীতা করের অভিমত গ্রহণযোগ্য — "মধু তাই স্বপ্ন দেখে কেদার মিস্ত্রির মত সে বড় মিস্ত্রি হয়েছে। কেদার মিস্ত্রির মত কাঁচা ভিটের বদলে পাকা বাড়ী, শান বাঁধানো ঘর, রূপোর মল পায়ে তার প্রেমিকা মোহ হয়েছে মধুর স্ত্রী। অর্থাৎ আধুনিকতার অন্য লক্ষণ যে যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙন তার ইঙ্গিতও সমরেশ দেন।"[৮০] মধুর কর্মদক্ষতায় কারখানার পাগলা সাহেব খুশি। মধুকে সে নিজের হাতে কাজ শেখায়। পরিচয় করে দেয় কারখানার যন্ত্রাংশের সঙ্গে। লখাই মধুর সাহেব প্রীতিকে মেনে নিতে পারে না। একদা শ্যামের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল বিদ্রোহী পরাজিত সিপাহি লখাই। শ্যাম ও কালীর প্রথম সন্তানের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তাদের বিশ্বাস লখাই

মনসার পুত্র হিসাবে তাদের ঘরে এসেছে। নারায়ণের স্ত্রী কাঞ্চী বউয়ের সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। আবদ্ধ হয় বিবাহ বন্ধনে। সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থ সিপাহি লখাই চেয়েছিল স্বাধীনতা। তাই কোম্পানি সাহেব কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করতে এলে সে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের মতো মধু ও পুত্র হীরাকে সচেতন করতে চেয়েছিল। পুত্র হীরার সাহেব প্রীতিতে লখাই হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ লখাই হীরার হাতে যন্ত্র হাম্বর ভেঙে ফেলে। হীরাকে মধুর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। হীরাকে কেন্দ্র করে লখাইয়ের সঙ্গে মধুর লড়াই হয়। হাওা লড়াইয়ে মধু লখাই এর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। পরাজিত মধুকে লখাই ব্যঙ্গ করে বলে — 'তোর ঐ কারখানার পাগলা সাহেবকে বলিস কবজিতে এট্টুস সরষের তেল মেখে দিতে।' এই উক্তির মধ্য দিয়ে লখাইয়ের ইংরেজ বিদ্বেষ প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহী লখাইয়ের ছেলে হীরা কোম্পানির গোলাম হতে চায়। ব্যর্থ সিপাহি লখাই ভুলতে পারেনা যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনি। পরাজয়ের, আত্মযন্ত্রণার প্রতিশোধ নিতে চায় সে। পুত্র হীরাকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তার মনে হয় হীরা যেন বিশ্বাসঘাতক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। নতুন প্রজন্মের যুবকরা মানেনা কোন আচার বিচার। হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ মাংস খেতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এদের না আছে ঘরের মায়া, না আছে প্রাণের মায়া। মধু এদের দলের পাণ্ডা। পুরাতন প্রজন্মের মানুষরা নতুন প্রজন্মের যুবকদের কাছে বড় অসহায়। তারা শুধু ভয়ে বিস্ময়ে বেদনায় ও অপমানে একালের দিকে তাকিয়ে বৃথা রোষে গর্জায়। হাত জোর করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, অভিযোগ করে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে নায়ক লখাইয়ের মধ্যে যে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ মুখর আচরণ পাওয়া যায় 'জগদ্দল' উপন্যাসে তা অনেকটা নিষ্প্রভ। কোম্পানির অন্যায় আচরণে লখাই রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে ও আত্মযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ক্ষীণ। প্রতিবাদী লখাই কোম্পানির জোর করে জমি অধিগ্রহণ মেনে নিতে পারেনি। তাই সে বলে — "এ কোম্পানির যা চাইবে, তাই দিতে লাগবে ? আমার সংসার আমার প্রাণটাও ? তাই যদি, তবে এ প্রাণ নিয়ে শোরের বাচ্চার মতো আমি কোন গত্তে যেয়ে নুকোব। হরি, তার চেয়ে মরব, তবু এ বেজাতের হাতে এক গাছি চুলও বিকোবনা না-না-না।" সমরেশ বসু প্রথম পর্বের উপন্যাসের নায়করা আপসহীন। তারা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। তবু পরাজয় স্বীকার করতে চায়না। লখাই প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি সমর্থনযোগ্য — "বাংলা সাহিত্যে তিনি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে আছেন, তা হল একগুচ্ছ নায়ক — পরিকল্পনা, যারা নির্বিকল্প প্রভুত্বকে মানেনি,

যারা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে পরিবেশ-নিয়তি এবং সামাজিক-নিয়তি দুয়েরই বিরুদ্ধে।"[৯১] সাহেবের ঘোড়ার গাড়ির উড়ন্ত ধূলো দেখে লখাইয়ের চোখে ভেসে উঠে অতীতের যুদ্ধক্ষেত্রের ঝাপসা ছবি। তার প্রকৃত পরিচয় সেনপাড়ার লোকের কাছে অজ্ঞাত।

প্রতিবাদী লখাই কোম্পানির কাছে কৃষকদের জমি বিক্রি না করার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নায়েব গোমস্তাদের ভয়ে কৃষকরা আতঙ্কিত। কারণ বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে মিথ্যা অপবাদে কৃষকদের তারা জেলে পর্যন্ত পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় লখাইকে ইংরেজ পুলিশের রোষে পড়তে হয়। নায়েব নিবারণ ঘোষ তাকে ভয় দেখায়। তবু লখাই কোম্পানির কাছে মাথা নত করেনি। সে নিজের গোপন পরিচয় কাঞ্চী বউ ও সারদাকে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। পুত্র হীরা তাকে হতাশ ও নিরাশ করেছে। হীরার হাতের যন্ত্র হাম্বর লখাইয়ের হৃদয়ের ব্যর্থ আক্রোশ ও যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজদের প্রতি ক্ষিপ্ত লখাইয়ের আত্মমর্যাদা প্রখর। সে সারদার গানে ইংরেজ জয়ের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। লখাই মেনে নিতে পারেনা বেজাত অর্থাৎ ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের পায়ের ধূলো মাথায় নিতে চাওয়াকে। পূর্বে গারুলিয়ায় সারদার আখড়ায় জুতো পায়ে গোরা সাহেব প্রবেশ করলে লখাই তাকে অপমান করেছিল। লখাইয়ের কাছে "ফিরিঙ্গি জাত শত্রুরের জাত। পায়ের ধূলো কেন, তার ছোয়াও পাপ; অধম্মো।" জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের কোন সম্পর্ক নেই। জমিদার শ্রেণি ইংলণ্ডের মহারাণীর চাকর। তাই মজুমদার সেজবাবু লখাইকে বলেছিল — "আমরা নিধিরামের জাত হয়েছি।" লখাই জানে নায়েব নিবারণের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। গ্রামের সকলে কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করলেও প্রতিবাদী লখাই জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করে। প্রয়োজনে সে কোম্পানির সঙ্গে লড়তেও দ্বিধাবোধ করেনা। নায়েব গোমস্তারা খাজনা অনাদায়ের অপরাধে প্রজাদের জমি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়। লখাই স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল চটকল গড়ার জন্য চাষের জমি বিক্রি করবে না। "নায়েব মশাই আমাকে বাঁশ ডলা দিয়ে খুন করলেও আমি পারবনা।" লখাইও তার শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু রক্ষা করতে পারেনি। সেন দেওয়ানের কাছ থেকে পাওয়া জমি নায়েব কৌশলে লখাইয়ের টিপসই নিয়ে কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়। লখাই বিশ্বাস করে সই দিয়েছিল। নায়েব গোমস্তা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, প্রতারিত করে। সর্বস্ব হারিয়েও প্রতারিত লখাইয়ের নায়েব গোমস্তার প্রতি কোন ক্ষোভ বা ক্রোধ নেই। এমনকি সে গোমস্তার বিরুদ্ধে দেওয়ান গিন্নির কাছে অভিযোগ পর্যন্ত করেনি। বিদ্রোহী

পরাভূত ব্যর্থ সৈনিক লখাই বড় নিঃসঙ্গ, একাকী। তাই সে ব্যতিক্রমি চরিত্র। অতীতে সে ছিল রাজপুত হীরালাল, সিপাহি বিদ্রোহের পলাতক বিদ্রোহী। এখন সে লখাই বাগদি। জগদ্দল পর্বে লখাই আরো অসহায়। "কোম্পানি আর জমিদারে একজোটে পেছু নাগলে, মানুষে এঁটে উঠবে কেন ?" জমিদারের নায়েব গোমস্তার চক্রান্তে লখাই সর্বস্বান্ত। প্রতিহিংসায় সে শুধু জ্বলতে থাকে। লখাই প্রসঙ্গে সমালোচক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত পোষণ করেছেন — "মধু-রা গ্রামীণ শোষণের হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে পারে, কলের জীবনযাত্রার মধ্যে। কিন্তু যে লখাইবাগ্‌দীর খোলসের মধ্যে বিদ্রোহী সিপাই হীরালাল বেঁচে আছে, তারা পারে না বিদেশীর গোলাম হয়ে কাজ করতে।"[৮২]

'জগদ্দল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন চট কারখানার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা উপস্থাপন করেছেন। কোম্পানির সাহেবরা প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের প্রতারিত করেছে। শ্রমিকদের ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত কলে কাজ করতে হয়। সারা বিশ্বে যখন আটঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে, তখন ভারতীয় শ্রমিকরা ষোল ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য। নেই বেশি সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক। কারখানায় শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে শিশু শ্রমিকও নিয়োগ করে কোম্পানি। কলের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাহেব কারখানার শ্রমিকদের তাড়া দিয়ে কাজে নিয়োগ করে। শ্রমিকরা কাজে আসতে দেরি করলে সাহেব কখনো রেগে গালাগাল দেয়। আবার তাদের আদর করে পিঠ চাপড়ে বলে — "কাম অন মাই বয়, কাম পুরা করো, কোম্পানি ইনাম ডিবে।" শ্রমিকদের কাছে ওয়াল্টার পাগলা সাহেব ও ওয়ালিক অলিক সাহেব বলে পরিচিত। এই দুই সাহেব মধুর কাজের দক্ষতায় খুশি। মধুকে বড় মিস্তিরি তৈরি করতে চায়। সারা বিশ্বে চটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে পাটের চাহিদা। কারখানাগুলিতে ছিল সর্দারি প্রথা। কারখানার চাহিদা মেটানোর জন্য শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নয়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি থেকে সর্দাররা শ্রমিক নিতে আসত। বিনিময়ে সর্দাররা যেমন কোম্পানির সাহেবদের কাছ থেকে টাকা পেত, তেমনি কমিশন নিত শ্রমিকদের কাছ থেকে। কারখানার রহমান সর্দার দিল্লি থেকে এসেছে। নবাবের বংশধর বলে নিজের পরিচয় দেয়। কারখানার শ্রমিকদের তদারকির দায়িত্বে থাকে সর্দাররা। সর্দারকে যেমন সমীহ করে সাহেবরা, তেমনি ভয় করে শ্রমিকরা। কারখানার পরিবেশে এসে কাতু স্বৈরিনীতে পরিণত হয়েছে। নারায়ণের নতুন জীবন সঙ্গিনী হয়েছে বিমলি। কারখানায় সকলের কাছে সে ডাকাত বিমলি বলে পরিচিত। অসাধারণ তার কাজের দক্ষতা। এক সঙ্গে চারটি

তাঁত চালায়। পূর্বে বিমলির অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কারখানার শ্রমিকদের দাম্পত্যবন্ধন বড় শিথিল। তারা এক সঙ্গে থাকে অথচ তাদের পরিচয় স্বামী স্ত্রী নয়। বিমলির একটি রংঘর আছে। সেখানে কারখানার সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে উঁচুস্তরের কর্মীরা পর্যন্ত আসে। কিন্তু সাহেব শ্রমিকদের চটাতে চায়না। নায়ক লখাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল নারায়ণের স্ত্রী কাঞ্চী বউয়ের সঙ্গে। পরে রাধামাধব আখড়ার সারদার সঙ্গে গড়ে ওঠে তার প্রেমের সম্পর্ক, ছিল একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা। মধু মদনের দ্বিতীয় স্ত্রী মোহকে নিয়ে ঘর বাঁধে, পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে। মেয়ে পুরুষ শিশু বৃদ্ধ তাঁতি স্পিনার, অয়লার, মিস্তিরি সকলেই ডুবে আছে যন্ত্রের মধ্যে। চাষের জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যন্ত্রচালিত কারখানা। কারখানাকে কেন্দ্র করে উঠেছে ইঁটের ইমারত। যাকে বলে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য কনস্ট্রাকশন্। শ্রমিকদের চাহিদা মেটানোর জন্য সাহেব ম্যাকলিস্টার স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন দ্বীপের বন্দী শিবির থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত একশোটি মেয়ে বাউরিয়া কারখানায় এনেছিল। এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। এই কয়েদিরা অনেক আশা নিয়ে ভারতে এসেছিল। নেটিভ শ্রমিকদের থেকে অধিক পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছুই পায়নি তারা। হতাশ ও নিরাশ হয়ে তারা আবার অপরাধের জগতে ফিরে যায়।

ভারতের শ্রমিকরা কারখানার যন্ত্রে আবেগে আপ্লুত হলেও যন্ত্রের শাসন তাদের বশ মানাতে পারেনি। সারা বছর শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করে। শরৎকাল থেকে বসন্তকালের মাঝামাঝি বাংলার গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠান শুরু হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা, চড়ক মেলা, এছাড়া হাটে-মাঠে দেশ বিদেশ থেকে আসে যাত্রাদল, কবিগান। বাড়ি বাড়ি বসে নাচের আসর। একঘেয়েমি জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায় তারা। শ্রমিকরা কারখানার সাহেবদের শাসন উপেক্ষা করে চলে যায় মেলায়। যন্ত্রের শাসন তারা মানেনা এই সময়। নারায়ণ বিমলির মতো মধুও সাহেবকে না জানিয়ে চলে যায় গঙ্গাসাগর মেলায়। এই সময় কারখানা গুলিতে শ্রমিকের অভাব দেখা যায়। লেখক দেখিয়েছেন কারখানার শ্রমিকদের উপর সাহেবদের অত্যাচার ও যৌন নিপীড়ণের চিত্রকে। কৃষকরা জমিদার, নায়েব, গোমস্তাদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামসমাজ ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে চলে আসে কারখানায়। ইংলণ্ডের রাণীর আইন সাধারণ মানুষরা বোঝে না, তা বোঝে বাবুরা। তাদের ধারণা ছিল কারখানায় কোন শাসন ও শোষণ নেই। "কামাব, খাব, পরোয়া নেইকো। বাবু দেমাক দেখায়, আমিও দেমাক দেখাই। আসুক দিকিনি একবার যন্ত্রের গাঁট খুলতে।

নাড়ি খসে যাবে। সে কথা নয়, খুড়ো ছ' মাসের পিণ্ডি জুটছেনা ঘরে, কলের পয়সা না আনলে চলবে কেন ?" কিন্তু সেখানেও তারা কারখানার সাহেবদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পবন চাঁড়াল তার প্রেমিক। তারাকে বিবাহ আসর থেকে সে তুলে নিয়ে যায়, চলে যায় কর্মের সন্ধানে কারখানায়। কারণ সমাজ এই অবৈধ বিয়েকে মেনে নেবে না, দেবে না কেউ কাজ। কারখানায় পবনের স্ত্রী রক্ষা পায়নি। একা তারাকে পেয়ে ক্রুকসন সাহেব তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পবন প্রতি আক্রমণ করে সাহেবকে। ক্রুদ্ধ পবনের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে স্ত্রী তারা ভয়ে গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করে। প্রতিবাদী লখাই ক্রুকসন সাহেবের এই পীড়নকে মেনে নিতে পারে নি। সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে পবনকে। স্ত্রীকে হারিয়ে পবন নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। ক্রুকসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে অস্বীকার করে। ক্ষুব্ধ লখাই পবনকে বলে যে নিজের স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করতে পারে না, তার মৃত্যুই ভালো। সেই রাতেই পবন আত্মহত্যা করে। তেসুতি কলের সাহেব ফার্ডিনাণ্ড (ভাণ্ডা) এর পিতৃ পরিচয় নেই। ফার্ডিনাণ্ডের মা মেরী শুঁড়িখানায় কাজ করত। জাহাজের নাবিকের দ্বারা ধর্ষণের ফলে ফার্ডিনাণ্ডের জন্ম হয়। শুঁড়িখানায় মেরীকে একাধিক সাহেবদের শয্যায় সঙ্গিনী হতে হয়েছে। শ্রীনাথের দুই নিঃসন্তান স্ত্রী কারখানার সাহেব ক্রুকসনের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে গর্ভবতী হয়। তাদের গর্ভের সন্তানের পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সাহেব, শুধু তাই নয়, তাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে। একজনকে মেরে ফেললে অপরজন পালিয়ে যায় অন্য কারখানায়। ক্রুকসন সাহেবের মতো ফার্ডিনাণ্ড সাহেব সুরা ও নারীতে আসক্ত। তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি লক্ষ্মীবাগদিনিও শুণ্ডিনী বিনু মুচিনি। ফার্ডিনাণ্ডের দ্বারা বিনু মুচিনি গর্ভবতী হলে সে বলে — "তোর ছেলে আমাকে 'বাপ' বললে আমি গলা টিপে মেরে ফেলব।" কোম্পানির সাহেবরা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বলপূর্বক শ্রমিকদের ধর্ষণ করে। লিটলজন সাহেব চম্পা নামে এক নেটিভ আয়াকে জোর করে ধর্ষণ করে। চম্পাকে সে ঘৃণা করে, আবার তাকে শয্যার সঙ্গিনীও করে। সাহেবদের যৌন অত্যাচারে কেউ পালিয়ে যায় অন্য কারখানায়, আবার কেউ আত্মসমর্পন করে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতরা কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি ব্রাহ্মণ কায়স্থ উচ্চবর্ণের লোকেরা পর্যন্ত। সংস্কৃত পণ্ডিত সাত্ত্বিক একাহারী ব্রাহ্মণ জীবনবাবু টোল চতুষ্পাঠীর জীবিকা ছেড়ে কারখানার কেরানির কাজে নিযুক্ত হয়েছে। তার ইংরেজি জ্ঞান অতি দুর্বল। সাহেবদের প্রিয়পাত্র

হওয়ার জন্য সে কারণে অকারণে তোষামদ করে। এদের কাছে মূল্যবোধ অর্থহীন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ জীবনবাবু গঙ্গায় স্নান করে আহার গ্রহণ করেন। শিশু বাগদি হীরালাল স্নানের পর তাকে স্পর্শ করলে জীবনবাবু নিজেকে অশুচি মনে করে। হীরার শাস্তি চেয়ে সাহেবের কাছে অভিযোগ করে। সাহেব তার অভিযোগ অস্বীকার করলে অপমানিত বোধ করে জীবনবাবু নিজের মাথায় নিজে আঘাত করে। সেই সময় জাত পাতের ছোঁয়াছুয়ি যে চরম ছিল তা লেখক জীবনভট্টাচার্যের চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ যদু ভট্টাচার্য পূজা শেষ না করে কথা বলেন না। বাগদি লখাইয়ের ছায়া মাড়াবেন না এই জন্য তার গায়ে গোবরজল ছিটিয়ে দেন। লখাই তা নীরবে মেনে নেয়। ছেড়ে দেয় ব্রাহ্মণের চলার পথ। পূর্বে হলে লখাই প্রতিবাদে গর্জে উঠত। এখানে লখাই যেন নিষ্প্রভ। পূর্বের কোন তেজ বিদ্রোহ নেই। এদের মধ্যে গগন বোস ব্যতিক্রমী চরিত্র। উচ্চশিক্ষিত, জীবিকার প্রয়োজনে কারখানায় কেরানির কাজ নিয়েছে সে। একদা সে কলকাতা শহরে চাকরি করত। সে দেখেছে কলকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মূল্যবোধহীনতাকে। কিন্তু গগন আবেগে তাদের সঙ্গে নিজের মূল্যবোধ বিকিয়ে দিতে পারেনি। সমর্থন করেনি ইংরেজ সাহেবদের অন্যায়কে। অমৃতবাজার পত্রিকায় ফুলার সাহেবের ভারতীয়দের উপর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লিখেছিল। "ফুলার সাহেব চার্চে যাবার আগে সহিস নামে এক ব্যক্তির উপর রেগে তাকে লাথি মেরে ফেলেছিল। এরূপ গুরুতর অপরাধে আগ্রার ম্যাজিস্ট্রেট লিডস সাহেব বিচারে সাহেবকে মাত্র ত্রিরিশ টাকা জরিমানা করে, অনাদায়ে পনেরো দিন বিনা পরিশ্রমে জেল বাস। ... কিন্তু গগনের 'প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে এই প্রবন্ধ অমৃতবাজার ছাপাতে সাহস পায়নি।" এই প্রসঙ্গে সমালোচক ঝুমা রায়চৌধুরীর অভিমত সমর্থনযোগ্য — "এখানে উঠে এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ছবি। উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সেদিন সাহেবদের পা চেটে চলত। যেমন বাগবাজারের অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি হয়ে গিয়েছিল ইংরেজি পেপার।"[৯০] কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল গগনের। তাদের সংস্পর্শে এসে অচিরে তার মোহভঙ্গ হয়। ফিরে আসে জগদ্দলের সেনপাড়ায়। সে সাহেবের অফিসে কাজ করে কিন্তু সাহেবদের তোষামোদ করে চলেনা। বঙ্গসিন্ধু পত্রিকার সম্পাদক রাম বাড়ুজ্যে। তিনি গগন বোসের প্রবন্ধ অনুবাদ করে বঙ্গ সিন্ধু পত্রিকায় ছাপান। রাম বাড়ুজ্যে কৃষক অখিলের হয়ে মামলা লড়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের কুফল ও জমিদারের সুফল দেখানোর অপরাধে জমিদারের রোষে পড়তে হয় তাকে।

চটকল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাউরিয়া কটন মিল বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী কোম্পানি ম্যাকস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না দেশীয় কটন ইণ্ডাস্ট্রি। কটন মিল পরিণত হয় জুট মিলে। কলকাতার তৈরি সুতো ডাণ্ডিতে রপ্তানি হয়। ডাণ্ডি থেকে কাপড় তৈরি হয়ে ভারতে আসে। ফলে সুতোর অভাবে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া ভারত থেকে ডাণ্ডিতে কাঁচা পাট এক্সপোর্ট করতে কোম্পানিকে কোন ট্যাক্স দিতে হত না। সরকারের বৈষম্যমূলক আইনের ফলে দেশীয় শিল্প ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে।

লখাই শেষ পর্যন্ত নায়েবের চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তবু সে কোম্পানির সাহেবের কাছে মাথা নত করেনি, করেনি পরাজয় স্বীকার। একদা ওয়ালিক সাহেব লখাইয়ের সাহসে খুশি হয়ে কারখানায় চাকরির প্রস্তাব দেয়। লখাই সে প্রস্তাব অবজ্ঞা ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। অসুস্থ পুত্র হীরার শুশ্রূষার জন্য লখাই গভীর রাতে জীবনকৃষ্ণের বাড়ি যাওয়ার পথে ওয়ালিক সাহেবের সঙ্গে পথে দেখা হয়। সাহেব লখাইয়ের পরিচয় জানতে চাইলে, সেও সাহেবকে পাল্টা প্রশ্ন করে। আজও সে ওয়ালিক সাহেবের কাছে মাথা নত করেনি। তবে লখাই পূর্বের মতো হিংস্র বাঘের মতো গর্জে ওঠেনি। পূর্বের তেজ ও শক্তি নেই। সে যেন শান্ত ও অসহায়। দুঃসহ যন্ত্রণায় সে সারদার আখড়ায় শান্তির আশ্রয় খোঁজে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ফলে যেমন সামন্ত্রতন্ত্র ভেঙে গেছে, তেমনি সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যায়। নায়ক লখাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হুগলিও চব্বিশ পরগণার কৃষি নির্ভর মানুষের কাছে এযুগটা যেন দিশেহারার। আবার সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার সংবাদ ও তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসির সংবাদ লখাইকে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করে। ❑

১০

সমরেশ বসু প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি রচনাকালে মার্কসীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখক সমরেশ বসু দেখিয়েছেন যে নিয়তি অপরিবর্তনীয় নয়। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের নায়ক শিল্পী মহিমের সঙ্গে লেখক সমরেশ বসুর জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্ররা অসংস্কৃত, নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের মানুষ। চরিত্রগুলি অপরাজেয় ও সংগ্রামশীল। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের নায়ক শিল্পী মহিম জমিদারের রোষে পরে সর্বস্বান্ত হয়েছে তবু পরাজয় স্বীকার করে নি। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের নায়ক লখাই বেরিলির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসলেও নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারের প্রহরী হিসাবে নায়েব মশাইয়ের চক্রান্তে সর্বস্ব হারিয়েছে, তবু সে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ করেছে তাদের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে। 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ ওরফে ফোর টুয়েন্টি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই পর্বের উপন্যাসের পটভূমি ছিল বস্তি অঞ্চল। 'উত্তরঙ্গ', 'বি.টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'জগদ্দল', 'ছিন্নবাধা' উপন্যাসের পটভূমি ছিল বস্তি অঞ্চল। এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্ররা ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা জনজীবনের অন্তর্গত। এই পর্বের উপনাসগুলি লেখার সময় সমরেশ বসুর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেও অকপটে স্বীকার করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই তাঁর চার পাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। তিনি নিজেও সক্রিয় ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই জড়িত ছিলেন। তাই চরিত্রগুলিও ছিল আদর্শযুক্ত ও কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। বিশেষ করে কারখানার শ্রমিকদের প্রতি লেখকের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসের ভজুলাট সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবু রাজনৈতিক বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। রাজনৈতিক বিপ্লবীরা তার রেস্টুরেন্টে আড্ডা মারার অপরাধে পুলিশ বার বার তল্লাশি চালিয়েছে, তবু সে বিপ্লবীদের তার রেস্টুরেন্টে আশ্রয় দিয়েছে। 'বাঘিনী' উপন্যাসের নায়ক চিরঞ্জীব কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আস্থা হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেও সে আবার ফিরে আসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে। এই পর্বের উপন্যাসে রয়েছে রোমান্টিকতা। 'উত্তরঙ্গ', 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'সওদাগর', 'ছিন্নবাধা', 'বাঘিনী' ও 'জগদ্দল' উপন্যাসে প্রধান চরিত্ররা সত্যনিষ্ঠ হলেও রোমান্টিক। 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে ফুলকি ও কালোর মধ্যে ছিল ভালোবাসা। 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিলাস ও হিমির সঙ্গে ছিল রোমান্টিক এক সম্পর্ক। 'বাঘিনী' উপন্যাসে চিরঞ্জীব ও দুর্গার মধ্যে গভীর আবেগময় প্রেমকে দেখি। এই পর্বের উপন্যাসে রয়েছে আঞ্চলিক পটভূমি। এই পর্বের চরিত্ররা আপাতভাবে পরাজিত, কিন্তু এক বৃহত্তর এক জয়কেই তারা প্রকাশ করে। সমালোচক প্রসূন ঘোষের অভিমত এ ক্ষেত্রে

গ্রহণযোগ্য — "এই পর্বে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গীয় সমাজের বন্ধন মধ্যবিত্তের মতো দৃঢ় নয়, অপেক্ষাকৃত শিথিল, কিন্তু তা আবার মধ্যবিত্তের মতো অন্তঃসারশূন্যও নয়।"[৮৪] মানব সম্পর্কের এই দিকটি 'বি. টি. রোডের ধারে', 'ছিন্নবাধা', 'বাঘিনী', 'সওদাগর', 'জগদ্দল' প্রভৃতি প্রথম পর্বের উপন্যাসে রয়েছে। এই পর্বের উপন্যাসের চরিত্ররা নিঃশেষে জীবন সংগ্রামে রত। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধায়ের অভিমত এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য — "এই পর্বের উপন্যাসের প্রধান হয়ে উঠেছে ব্যক্তির অপরাজেয়তা। তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তবু কখনোই পরাজয় স্বীকার করেনা।"[৮৫] ❑

উল্লেখপঞ্জি

১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসুর রচনাবলী ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ) ২০০১ (তৃতীয় মুদ্রণ) 'সমরেশ বসু ঃ ব্যক্তি ও লেখক' এই শিরোনামের ভূমিকা।

২। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি; ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১০।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২।

৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসুর রচনাবলী ১' , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ) ২০০১ (তৃতীয় মুদ্রণ), 'সমরেশ বসু ঃ ব্যক্তি ও লেখক' এই শিরোনামের ভূমিকা।

৬। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশর বসুর ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৭।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮।

৮। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ঃ 'উত্তরঙ্গ ঃ প্রাপ্তি ও বেদনা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার সম্পাদিত ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ২৯১।

৯। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর'; এবং মুশায়েবা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৯২।

১০। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ঃ 'উত্তরঙ্গ ঃ প্রাপ্তি ও বেদনা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার সম্পাদিত ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ২৮৯।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৮।

১২। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৮।

১৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ), ১৯৮৪ (সপ্তম সংস্করণ), পৃষ্ঠা - ৭৩৩।

১৪। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ঃ 'উত্তরঙ্গ ঃ প্রাপ্তি ও বেদনা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার সম্পাদিত ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ২৯৩।

১৫। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর' ; এবং মুশায়েবা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৯২।

১৬। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ২৫, ২৬।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮।

১৯। জহর সেন মজুমদার ঃ 'উপন্যাসের ঘরবাড়ি', পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৭৭।

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮০।

২১। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৪৮।

২২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫০।

২৩। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশ বসুর ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৩০।

২৪। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর'; এবং মুশায়েবা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৯৩।

২৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসুর রচনাবলী ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ) ২০০১ (তৃতীয় সংস্করণ), 'সমরেশ বসু ঃ ব্যক্তি ও লেখক' এই শিরোনামের ভূমিকা।

২৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীমতী কাফে — ইতিহাসের রাজপথে ঃ ট্র্যাজিক উল্লাসে', সত্যজিত চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩০৯।

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১১।

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৫।

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৯।

৩০। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশর বসু ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৩৯।

৩১। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৬৫।

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩।

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮২।

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৩।

৩৫। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশর বসু ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৪৫।

৩৬। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৭৩।

৩৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'শ্রীমতী কাফে — ইতিহাসের রাজপথে ঃ ট্র্যাজিক উল্লাসে', সত্যজিত চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩১২।

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৯।

৩৯। হিতেন্দ্র মিত্র ঃ 'সমরেশ বসু মুক্তি পন্থার সন্ধান', প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ১৪৫।

৪০। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৫১।

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪।

৪২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশর বসু ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৪৯।

৪৩। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৫৭।

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৮।

৪৫। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৯২।

৪৬। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৬৯।

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৭।

৪৮। তদেব , পৃষ্ঠা - ১২৯-১৩০।

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৭।

৫০। সনৎকুমার নস্কর ঃ 'বাঙলা উপন্যাসে মালো জীবন ও সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', উদয় চাঁদ দাশ, বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ঃ 'নদীমাতৃক উপন্যাস ধারায় - গঙ্গা', শিলালিপি, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৪০।

৫১। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -১৪১।

৫২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশর বসু ঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৫৭-৫৮।

৫৩। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ 'গঙ্গা ঃ দক্ষিণ সমুদ্রের ডাক', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩২৭।

৫৪। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৪১।

৫৫। ছন্দা রায় ঃ 'নিবারণ ঃ অদৃশ্য সুতোর টানে', উদয় চাঁদ দাশ, বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ঃ 'নদীমাতৃক উপন্যাস ধারায় 'গঙ্গা', শিলালিপি, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১২৯।

৫৬। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৪৬।

৫৭। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ 'গঙ্গা ঃ দক্ষিণ সমুদ্রের ডাক', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৭।

৫৮। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৯৫।

৫৯। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৭১।

৬০। সমরেশ বসু ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসুর রচনাবলী ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ), ২০০০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), প্রাক্ কথনে অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, পৃষ্ঠা - ৮৭৮।

৬১। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপনি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৭১।

৬২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৮।

৬৩। ঝুমা রায় চৌধুরী ঃ 'কথা সাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন ১', পূর্বাশা, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ৫২৫।

৬৪। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৮২।

৬৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮২।

৬৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯০।

৬৭। অনন্তকুমার চক্রবর্তী ঃ 'ছিন্নবাধা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩৪৩।

৬৮। ঝুমা রায় চৌধুরী ঃ 'কথা সাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন ১', পূর্বাশা, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ২১৫।

৬৯। হিতেন্দ্র মিত্র ঃ 'সমরেশ বসু মুক্তি পন্থার সন্ধান', প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ১৪৭।

৭০। অনন্তকুমার চক্রবর্তী ঃ 'ছিন্নবাধা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩৪০।

৭১। হিতেন্দ্র মিত্র ঃ 'সমরেশ বসু মুক্তি পন্থার সন্ধান', প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ১৪৭।

৭২। ঝুমা রায়চৌধুরী ঃ 'কথা সাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ণ ১', পূর্বাশা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২১৯।

৭৩। সমরেশ বসু ঃ 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি ঃ 'দেশ' ২২শে, নভেম্বর-১৯৮৬।

৭৪। অনন্তকুমার চক্রবর্তী ঃ 'ছিন্নবাধা', সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার (সম্পাদিত)ঃ 'সমরেশ বসু ঃ স্মরণ সমীক্ষণ', চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩৪৫।

৭৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৯।

৭৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'সমরেশ বসুর রচনাবলী ১' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ), ২০০১ (তৃতীয় মুদ্রণ), 'সমরেশ বসু ঃ ব্যক্তি ও লেখক' এই শিরোনামের ভূমিকা।

৭৭। বারিদবরণ চক্রবর্তী ঃ 'সমরেশ বসু ঃ জীবন ও সাহিত্য', শিলালিপি, ২০০৬, পৃষ্ঠা - ২৯।

৭৮। রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'স্বাধীনতা - উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', ভারতী বুক এজেন্সী, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ২৮৬।

৭৯। নিতাই বসু ঃ 'কালকূট সমরেশ', জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৭২।

৮০। রীতা কর ঃ 'জীবন শিল্পী সমরেশ বসু', বামপা পুস্তকালয়, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৪।

৮১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা উপন্যাস ঃ দ্বান্দিক দর্পন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ১০৯।

৮২। রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'স্বাধীনতা — উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', ভারতী বুক এজেন্সী, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ২৮৬।

৮৩। ঝুমা রায় চৌধুরী ঃ 'কথা সাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন ১', পূর্বাশা, ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১৫৯।

৮৪। প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯৬।

৮৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ সমরেশ বসু রচনাবলী ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ), ২০০০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

৮৬। সমরেশ বসুর 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গ', 'বি. টি. বোডের', 'শ্রীমতী কাফে' উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ "সমরেশ বসু রচনাবলী ১", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ), ২০০১ (তৃতীয় মুদ্রণ) প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৮৭। সমরেশ বসুর 'সওদাগর', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী', 'ছিন্নবাধা' উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু রচনাবলী ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ), ২০০০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৮৮। সমরেশ বসুর 'জগদ্দল' উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ 'সমরেশ বসু রচনাবলী ৪', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ), ২০০৩ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

****